শালিক কি চড়ুই

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

প্রচ্ছদসজ্জা
অজিত গুপ্ত

প্রথম সংস্করণ
৭ই বৈশাখ, ১৩৬১
তিন টাকা

মুদ্রাকর : শ্রীত্রিদিবেশ বসু, বি. এ.
কে. পি. বসু প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা ৬

তাতা-কে

শালিক কি চড়ুই

থলে হাতে সকালবেলা তারাপদ বাজারে যায়। তারাপদ দত্ত। শক্ত মজবুত গড়ন, কাটখোট্টা চোয়াল।

কিন্তু মুখে মিষ্টি একটা হাসি লেগে আছে, লেগে থাকত আগে সারাক্ষণই, এখন মাঝে মাঝে সেই হাসি দেখা দেয়, তা-ও বন্ধুদের সঙ্গে যখন দেখা হয়। এবং হাসিটা, প্রকৃতই যা এককালে মধুর ছিল স্বতস্ফূর্ত ছিল এখন যেন একটু জোর করে বেশ চেষ্টা করে তারাপদ তা ফিরিয়ে আনে। বন্ধুরা তা ঠিক ধরতে পারে কিনা তারাপদ চিন্তা করে বৈকি।

অর্থাৎ সেই সচেতনতা নিয়ে তারাপদ ওদের সঙ্গে দেখা হলেই হাসে, ভয়ে ভয়ে হাসে, চোরের মত হাসে।

তারাপদ জানে তার এ হাসি সে হাসি নয়।

আর আশ্চর্য, বেছে বেছে যত রাজ্যের বন্ধু, বাজার করতে চলল যখন, পর পর তিনজনের সঙ্গেই হয়ত দেখা হয়ে গেল। এক সকালের মধ্যে।

'হাতিঘোড়া কিনতে চললে নাকি', প্রথম বন্ধু প্রশ্ন করেছিল।

তারাপদও পাল্টা জবাব দিয়েছে, বন্ধুর চোখের সামনে থলেটা তুলে ধরে। 'এই পাত্রে ওরা ধরবে ?'

থলেটা খুবই ছোট। বন্ধুর জ্ঞান হয় তখন।

'তা-ও বটে।' থলের বহর ও দৈর্ঘের উপর চোখ বুলিয়ে বন্ধু মাথা নাড়ে, 'দু'টি ত প্রাণী, কী-ই-বা আর লাগে।'

মিষ্টি করে হেসে তারাপদ বন্ধুর কথা অনুমোদন করে এগিয়ে যায় বাজারের দিকে।

হাঁ, দু'জন ওরা। দু'টি প্রাণী।

তারাপদ হেসে এবং নীরব থেকে বন্ধুর কাছে একথা স্বীকার করে এসেছে। ওরা দুই জন।

তারপর হয়েছে দ্বিতীয় বন্ধুর সঙ্গে দেখা।

আদ্দির ঢিলে পাঞ্জাবি, হাতে সিগারেট, আঙুলে আংটি বন্ধুর।

'বিয়ে করে ডুমুরের ফুলটি হয়ে গেছ।' বন্ধু পিঠে হাত রেখেছে। কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়েছে তারাপদর জোরে।

তারাপদ একপলক দেখে নিয়েছিল নিজের পরনে ময়লা একটা লুঙি, হাতকাটা ফতুয়া গায়ে। একহাতে বাজারের থলে অন্যহাতে বিড়ি।

তথাপি, যেন চেষ্টা করে, জোর করে তারাপদ বন্ধুর চোখের দিকে চেয়েই হেসে ফেলেছে।

'ওকথা বলা তোমাদের অন্যায়, প্রফুল্ল।' হাসতে হাসতে বন্ধুকে বুঝিয়েছে তারাপদ, 'অফিস বাজার,—সবদিক ছুটোছুটি করে আর—'

'থাকো বাবা সুখে।' বলে কিছুটা যেন অনুতপ্ত হয়ে বন্ধু সরে গেছে।

বন্ধু সরে যেতে তারাপদ ফের নিজের পোষাকের দিকে তাকিয়ে, পোষাকের কথা আর ভাবেনি, ভেবেছে ওরা দু'জন যে সুখে আছে প্রফুল্ল সত্যি কি বিশ্বাস করতে পারল না।

নাকি তারাপদর হাসিতে এতটুকু গলদ ছিল। এমনভাবে অভিমান দেখিয়ে সরে পড়ল কেন ও। অপরের সুখ দেখলে মানুষ দুঃখ পায় কি?

আর বিয়ের পর সুখ অসুখের কথাটাই যেন ওঠে বেশি। উঠছে আজকাল। তারাপদ কি সুখী নয় ?

ভাবতে ভাবতে তারাপদ অগ্রসর হয় এবং হাতিঘোড়া একপাশে সরিয়ে রেখে অথবা হাতিঘোড়ার সামনে থেকে নিজেকে ছিনিয়ে এনে উপুড় হয়ে পড়ে চুনোর ওপর, চিচিংগার ঝাঁকার ওপর।

রুই কাত্‌লা কপি বড আলু ওঠে না, ধরে না তার এই ছোট্ট থলেতে। হাতিঘোড়া সব থেকে যায়। তাদের নিতে আসে যারা, তাদের থলে বড়, হাত জবরদস্ত।

তাদের থম্‌থমে চেহারার সামনে দাঁড়িয়ে কোনো জিনিসের দর করা বা তাদের কথা থামিয়ে তোমার আব্দার জানানো দোকানদার বলে দোকানদার, গেঁয়ো চাষাটিও সহ্য করবে না।

তোমরা কেরানী তোমাদের জাত আলাদা,—ঐদিকে থাকো, শুক্‌নো ডাঁটা আর পচা জলঢুসঢুসে চুনো চিংড়ি পাও যা সস্তায়, নিয়ে কেটে পড়।

এবং সেগুলো কিনে তারাপদ যখন চোখ তুলল দেখল আর একজন বন্ধু দাঁড়িয়ে আছে কোমরে হাত দিয়ে। বন্ধুর বাজার চাকরের হাতে। এর সবই হাতিঘোড়া। একটাও ছোট নয়। এই এতবড় সতেজ নধর-বেগুন, ওল, ঝকঝকে সজীব বিশালকায় ভেট্‌কি, গল্‌দা।

'কি নিয়ে চললে হে।' তারাপদর বাজার করা দেখে ফেলার পরও বন্ধু যখন ঠাট্টা করে তখনও কিন্তু তারাপদ মিষ্টি করে হাসে। হাসতে হয়।

'ছিলাম একজন, হয়েছি দু'জন, চাকরি তো আর বড় হল না যে আয় বাড়বে আর তাই দিয়ে বাছা বাছা সওদা নিয়ে বাড়ি ফিরব তোমার মত।'

'কিন্তু আমি জানি ও না-বাছা জিনিসই অমৃত হয়ে উঠছে একজনের হাতের গুণে, তাই হাতের কাছে যা পাচ্ছ তাড়াতাড়ি নিয়ে সরে পড়ছ, পাছে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলে বিলম্ব হয় রাস্তায়।'

'সেটা অফিসের তাড়ায়।'

'না কি বৌ!' বন্ধু জর্দা-পানের পিক্ ফেলে ফিক্ করে হাসে।

মৃদু হেসে তারাপদও তখন সরে পড়ে।

হাতের গুণে;—হেসে তারাপদ বন্ধুকে বোঝাতেই চেয়েছিল শেষটায়, হাতের অশেষ গুণ আছে এমন একটি মেয়েকেই সে বিয়ে করেছে।

পৃথিবীতে এত বন্ধু আছে জানা ছিল না তারাপদর। ধারণাই তার ছিল না যে বিয়ের পর, বেছে বেছে বন্ধুদের সঙ্গেই দেখা হবে আর তারা এতসব কথা বলবে। বলতে গেলে এক রকম গায়ে পড়ে। যেচে। আর সব বৌ-সংক্রান্ত।

কই, বন্ধুদের সঙ্গে আগেও তো দেখা হয়েছে।

তোমার জীবন নিয়ে, তুমি সুখে থাচ্ছ কি দুঃখ পাচ্ছ, একথা জিজ্ঞেস করতেই তাদের মনে হয়নি কোনোদিন। বেশ পরিষ্কার মনে আছে এটা তারাপদর।

আজ সবাই উৎসুক, ভীষণ ব্যগ্র। বিয়ের পর তারাপদ কেমন আছে। তাই তাদের ব্যগ্রতার, তারাপদ বৌ নিয়ে কেমন আছে মুহুর্মুহু সবাইর তাকানোর তীব্র উৎকণ্ঠার, উত্তেজনার মুখে তারাপদ শুধু ছিটিয়ে দিয়েছে হাসির ঠাণ্ডা একটি দু'টি ফোঁটা।

ভাগ্যিস কোনোকালে মিষ্টি হাসির জন্যে তারাপদ বিখ্যাত ছিল।

বন্ধুরা তার হাসি ভুলে যায়নি। এইটাই যা আশ্বাস। চুপ করে ভাবে তারাপদ বাজার সেরে যখন ফেরে।

আস্তে আস্তে সে গলিতে ঢুকল।

এখন অবশ্য তার আর নিরর্থক হাসির কসরত দেখাতে হয় না। এ পাড়ায় তার বন্ধুবান্ধব নেই। এখানে সে নিশ্চিন্ত। এখানে তারাপদ যেমন খুশি মুখের ভাব করতে পারে। যে ভাবে খুশি হাঁটতে পারে।

লুঙি গামছার একদর এই অঞ্চলে।

কেননা এখানে এদু'টি ছাড়া আর কিছু নেই।

সারি সারি ঘর। ঘরের গায়ে ঘর।

বারান্দা ব্যাল্‌কনি লন্ বাগান যেমন নেই এ পাড়ায় তেমনি নেই টাই স্যুট্ পাইপ বেয়ারা আর বিলিতি ধরনের হাসি।

এপাড়ায় মানুষ যখন হাসে বেশ বড় করে শব্দ করে হাসে। যখন হাসে না গুম্ মেরে থাকে।

দেখানো হাসি এখানে নেই। আর দেখবার মত মিষ্টি করে হাসলেও কেউ কারোর দিকে তাকায় না।

এখানে সবাই ব্যস্ত।

সকালে উঠে পুরুষরা বাজারে ছোটে। মেয়েরা উনুনে আগুন দেয়। বেলা আটটা বাজতে রান্না নেমে যায়। নাকে-মুখে গুঁজে কেরানীর দল পান চিবোতে চিবোতে অফিসে বেরোয়, আর তারপর, তখন থেকে, কলতলায় চৌবাচ্চার ধারে সুরু হয় মেয়েদের কলকাকলী, কাচ্চাবাচ্চার

পেনি-ফ্রক কাঁথা-ন্যাতা কাচার থুপ্ থুপ্ ছপাছপ্ শব্দ। হাসি দেখতে চুপ-চাপ বসে নেই কেউ। বা হাসতে।

নিজের ঘড়ি না থাকলেও সময় দেখতে তারাপদর অসুবিধা হয় না। পাশের বাড়ির জানালার ধারে টেবিলে একটা টাইম্‌পিস রেখে পরীক্ষার পড়া মুখস্ত করে ছেলেটি, এখানে এসেই সে লক্ষ্য করেছে। বাজারে বেরোয় যখন ঘড়িটা দেখে তারাপদ সময়ের একটা আন্দাজ করে নিতে পারে। এবং বাজার নিয়ে বাড়িতে ঢুকবার সময়ও সে আবার সেই ঘড়ি দেখে নিশ্চিন্ত হয়, না দেরি হয়নি বিশেষ।

কিন্তু ঘড়ি দেখে ঘরে ফিরেও তারাপদ আজ ঠিক সময়টির নাগাল পেল না। শান্তনু বাথরুমে গেছে।

বলছিল ও কাল। কালই প্রথম শুনল তারাপদ শান্তনুর মুখে ওর এই সামান্য অসুবিধার কথা।

অথচ এর আগে, মানে তাদের বিয়ের পর এই দু'মাসের ভেতর এক-দিনও কেন শান্তনু কথাটা জানায়নি সেজন্যে কাল সারাদিন, অফিসে বসে, বলতে গেলে সারাটা দুপুরই তারাপদ অস্বস্তিবোধ করেছে।

আজ তাই ঘুম থেকে উঠে চা না খেয়ে সে বাজারে বেরিয়ে গেছল।

ফাল্গুন মাস। গরম পড়েছে। কিন্তু ফাল্গুনের গরমই বৈশাখের দাবদাহ নিয়ে আসে এপাড়ায়। এই ঘিঞ্জিতে, তার ওপর এই তো একটু-খানি ঘর তারাপদর।

এই গরমে মাথা ধরবে অস্বাভাবিক কিছু নয়।

কাল সকালে সবে বাজার নিয়ে তারাপদ চৌকাঠে পা দিয়েছে। শান্তনু চলছিল স্নান করতে।

কেমন অপ্রস্তুত হয়ে গেছল ও তখন।

যেন লজ্জা পেয়েছে বেচারা, এমন হয়েছিল ওর মুখের ভাব। তাড়াতাড়ি হাতের তোয়ালে সাবান সিমেন্টের ওপর রেখে দিয়ে হাত বাড়িয়ে বাজারের থলেটা তারাপদর হাত থেকে নিতে নিতে বলছিল শান্তনু, 'কি রকম মাথা ধরেছে।'

'যা গরম।' তারাপদ অল্প হেসে শান্তনুর মুখে হাসি ফোটাতে চেয়েছে তৎক্ষণাৎ। 'তোমার বুঝি সকালে স্নান করা অভ্যাস।'

'আমরা সবাই।' শান্তনু মাটির ওপর বসে গেল তখুনি, থলের মাছ তরকারি ঢালছিল মেঝের ওপর। সাদা পিঠ বেয়ে বডিজের সুন্দর দু'টো স্ট্র্যাপ্। নিটোল মসৃণ গোড়ালির ওপর শরীরের ভার রেখে একটু সামনের দিকে ঝুঁকে কথা বলছিল হেসে, 'আমাদের বাথরুমের দরজায় এতক্ষণে লাইন পড়ে গেছে। বাবা! কার আগে কে ঢুকবে। মেজদার সোয়া আটটায় বাথরুম খালি চাই। মা যান সাতটা চল্লিশে। সেজদা যায় সাড়ে আটটায়। ছোড়দাও ন'টার আগে সেরে ফেলে। বাবা যাবেন স্নান করতে সকলের শেষে।' যেন ছবির মত ভাসছিল ওর চোখে সব।

'তুমি?' ঢোক গিলে বলতে আরম্ভ করেছিল তারাপদ, জানতে চেয়েছিল, দু'মাস আগে না জানি কেমন সময়, কখন স্নান করত ও। বিয়ের আগের ওর সব কিছুই যদি জানত সে। তারাপদ শান্তনুর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

'আমি ছ'টার আগে। সকাল ছ'টা না বাজতে। টুপ্ করে স্নানের ঘরে ঢোকা আর অমনি বেরিয়ে আসা কোনোদিন পারিনি।' বলে শান্তনু তারাপদর দিকে নয়, দেয়ালের দিকে চোখ ফেরালো, কালো বড় বড় চোখ। 'একটু একটু অন্ধকার থাকত তখন, পূবদিকের জানালা খুলে দিতাম। বাইরে ঠিক জানালা বরাবর নিমগাছটায় অসংখ্য ফুল আসে এসময়ে এই ফাল্গুন চৈত্র মাসে।' যেন নিজের মনে বাকি কথাগুলি বলল ও।

পদ্মপুকুর রোডের বাথরুম তার মনে আছে। বিয়ের পর একবার দু'দিন ও বাড়িতে থাকতে হয়েছিল, সে স্নান করেছে সেখানে। তখন মাঘের সবে স্থরু, নিমগাছে ফুল ফুটতে আরম্ভ করেনি। কেবল নিমগাছটাই মনে আছে তারাপদর।

আনাজের টুকরি একপাশে সরিয়ে রেখে শান্তনু চুপ করে মাছ কুটছিল। ওর নিটোল দশটি আঙুলের দিকে চেয়ে থেকে তারাপদ বলছিল, 'কাল থেকে আমি আর একটু সকাল বাজার সেরে ফিরব। আটটার আগেই মাছ কুটে ভাত চাপিয়ে দিয়ে তুমি স্নানে চলে যেও।

'কাল এত গরম না-ও পড়তে পারে।' চোখ তুলে স্বামীর চোখের দিকে তাকিয়ে স্থন্দর করে আবার হেসেছে শান্তনু।

'পাগল।' তারাপদও হাসছিল, 'দিনকে দিন গরম এখন বেড়েই চলেছে। সকালে স্নান করা অভ্যাস তোমার।'

আর কিছু বলেনি শান্তনু। মাছ কোটা শেষ করে উঠে কলতলায় চলে গেছে মাছ ধুতে। সেখানে দাঁড়িয়েও তারাপদ পরিষ্কার দেখতে

পাচ্ছিল ওর সাদা সুন্দর পিঠের একটু অংশ। রাতের অন্ধকারের চেয়েও দিনের নগ্নতায় অনাবৃত শরীর কত অদ্ভুত সুন্দর হয় কালই প্রথম দেখল তারাপদ। অনুভব করল।

কিন্তু বুকের ভেতর তার কাঁটার মতো ফুটছিল। সাধারণ এই কথা, একটু সকাল সকাল স্নান করবে তাই জানাতে এমন ইতস্ততঃ করে কেন ও, তারাপদ সারাদিনই কাল ভেবেছে। নিশ্চয়ই ক'দিন থেকে মাথা ধরে থাকবে, শান্তনু বলেনি। বলা উচিত ছিল।

তাই আজ তারাপদ সকাল সকাল ফিরে এসেছে। থলেটা হাত থেকে নামিয়ে রেখে সে কপালের ঘাম মুছল। শুনল জলের ছপ্‌ছপ্‌ শব্দ। শান্তনু স্নান করছে। হাল্কা একটা গন্ধ ভেসে আসছে ভিনোলিয়া সাবানের। এ সাবান অবশ্য তারাপদর দেওয়া নয়, বিয়ের সময় সাত বাক্স সাবান উপহার পেয়েছে শান্তু, আর কী সব দামি সাবান।

জলের ছপ্‌ছপ্‌ শব্দের সঙ্গে ওর গানের গুন্‌গুনও শুনল তারাপদ। আর তারাপদ ভাবল এখন অন্য কথা। না, এটাকে বাথরুম বলা চলে না। ঢেউ টিন দিয়ে ঘেরা কলতলারই একটি অংশ। ত্রিশ টাকায় বাথরুমওলা বাড়ি নেই শহরে। শান্তনুদের পদ্মপুকুর রোডের বাথরুম সত্যি কত ভাল। বাথরুম বারান্দা, সিঁড়ি দেয়াল মেঝে সব সব। আর এ তো হাতিবাগানের ঘিঞ্জিপাড়ার দেড়হাতি কবুতর খোপ। বাসের অযোগ্য।

কিন্তু—

তারাপদ ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলল।

মনে পড়ল তার, মনে হচ্ছে এখন আরো বেশি করে বন্ধুদের মধ্যেও

যারা অন্তরঙ্গ এমন একজন দু'জনের কথা। বিয়ের পর তারাপদ যেদিন বাসা ভাড়া করে ঠাট্টায় ওদের জিভ থেকে রস ঝরছিল বললে ভুল হবে, যেন বিষ ঝরছিল। মুখে হাসি, কিন্তু ভিতরে বিষ নিয়েই টিপ্পনি কেটেছে সবাই,—তারাপদকে ওরা হারাচ্ছে বলে নয়, মেসের উড়ে বামুনের হাতের কচু আর কুমড়োর ঘণ্ট দু'বেলা ও ওদের পাশে চাটাইয়ের ওপর বসে আর খাবে না বলে ঈর্ষায় এক একজন যেন ফেটে পড়ছিল। 'বেশ তো ছিলে বাবা, বিয়ে করোনি করোনি। এই বুড়ো বয়সে গলায় দড়ি ঝুলিয়ে কত সুখে থাক দেখব।'

ত্রিশ বছর বয়স অবধি এদেশে কোনো ছেলে বিয়ে করার জন্যে অপেক্ষা করে থাকলে সে ছেলে আর কোনোদিন বিয়ে করবে এটা যেন কেউ ভাবতেই পারে না। এবং বিয়ে করার আগে পর্যন্ত সে ছেলের কপালে জোটে বুড়ো বদনাম। কেবল তারাপদ নয়, অনেকেরই চোখকান বন্ধ করে এ অপবাদ সহ্য করতে হয়। আর আজ যারা বুড়ো বলে ঠাট্টা করছে কাল তারা এ বয়স অতিক্রান্ত হওয়ারও ঢের পরে হাসতে হাসতে বিয়ে করছে। তখন ওরা দিব্যি তরুণ হয়ে যায়। কতজনকে তারাপদ এমন তরুণ হয়ে যেতে দেখেছে। কিন্তু বুড়ো বলাতে তারাপদ বন্ধুর ওপর রাগ করেনি, চমকে উঠেছিল আর একটি কথায়। যেন সেই কথাই বলতে এসেছিল জগদীশ সেদিন।

'পদ্মপুকুর ভাল, পদ্মপুকুর রোডও চমৎকার, কিন্তু পদ্মপুকুর রোডের মেয়ে,—নমস্কার!'

'কেন?' বন্ধুর মুখের দিকে হঠাৎ হাঁ করে তাকিয়েছিল তারাপদ।

'আমাদের ঘরে পোষায় না ওরা, আমাদের মেয়ে তারা নয়।'

'মেয়ে বলছ কি, বল বৌ।' সংশোধন করতে গেছে তারাপদ, বন্ধু অট্টরোলে হেসেছে। একটি চোখ ছোট করেছে, আর একটি ভুরু বিস্ফারিত করে তারাপদকে বুঝিয়েছে, 'অই একই কথা। বিয়ের পর ওরা কোনো কালেই বৌ হয়ে থাকে না, তোমার বলে নয় কারোরই হতে পারল না।'

'মেয়ে হয়ে থাকতে তখনও ওরা ভালবাসে বুঝি?' উল্টো খোঁচা দিয়েছে তারাপদ, 'স্বামীর সংসারে এসে খোঁপা না বেঁধে বেণী বাঁধে? রান্না করতে বসে বিস্কি খেলে?'

'হ্যাঁ,' বন্ধু এবার দু'চোখ বিস্ফারিত করল, তর্জনী তুলে তারাপদকে হুঁসিয়ার করে দিয়ে বলল, 'সেই বেণী বাঁধে স্বামীর গলায় একদিন সুবিধামত ফাঁস পরিয়ে দিয়ে পদ্মপুকুর রোডে ফিরে যাবার জন্যে।'

'অপরাধ?'

'আনন্দ।' বন্ধু আবার শব্দ করে হেসেছে, 'এই করতে ওরা ভাল-বাসে, অপরাধ আবার কি?' হাসি থামিয়ে বন্ধু বলল, 'ওদের বাপের মস্তবড় টেনিসলন্ আছে, তোমার আছে কি?'

তারাপদ চুপ করল এবার।

'ওরা বিয়ের আগের রাতেও লেকে গিয়ে সাঁতার কাটে সে খবর রাখ?'

তারাপদ নিরুত্তর।

'বাপের সংসারে যখন থাকে ওদের অনেক বন্ধুর ভিড়, তুমি ডাকতে পার বন্ধুদের, হ্যাঁ, তোমার বন্ধুদের কথাই বলছি, রোজ চা খেতে বাড়িতে?'

'একজনের আয়, হয়েছি দু'জন।' বিরক্ত হয়ে গেছল তারাপদ। 'আমার আর্থিক অসচ্ছলতাই তোমাদের লক্ষ্য, তাই তো ?'

কিন্তু বন্ধু তারাপদর কথা কানে তুলল না। বলল সে তার নিজের কথাই। 'পদ্মপুকুর রোডে মস্তবড় পার্ক আছে, পার্কের ধারে বাদামগাছের ভিড়। বিকেলের রোদ যখন সোনা হয়ে বাদাম পাতার ফাঁক দিয়ে ওদের সুন্দর মুখে চিক্‌রিকাটা আল্‌পনা বোনে ওরা চোখ বুজে চুপ করে বসে থাকে পার্কের বেঞ্চিতে, বেঞ্চির পিঠে গাল ঠেকিয়ে গলা নামিয়ে। অন্ধকার হতে গলা তোলে, আকাশে যখন একটি দু'টি তারা ফোটে। সারসের মতো ওদের সাদা গলা তুমি ত্থাখনি, পদ্মপুকুর রোডের মেয়েদের ? আরে রাম, তোমার ঘরেই তো আছে সেই গলা।' কেমন করে বন্ধু হাসল।

'তুমি চুপ কর।' তারাপদ উঠে দাঁড়িয়েছিল। 'কেন এসব বাজে বকছ, সব মেয়ে কি—'

'তুমি জাত কেরানী কিনা, বামন হয়ে আকাশে হাত বাড়ানোর মতো ওখানে মরতে গেছ তাই বলছিলাম।' বন্ধু (তারাপদর মনে হচ্ছিল ওকে শত্রু) উঠে দাঁড়াল। 'টিম্‌টিমে সংসার মিন্‌মিনে একটি মেয়ে বিয়ে করলেই ভাল করতে, হাতে ধরে মারলেও মুখে যার শব্দটি বেরোয় না।' উঠে যাবার সময় বেশ রসিয়ে রসিয়ে জগদীশ বলছিল এসব।

অন্তরঙ্গ বন্ধুরা বিয়ের পর কত কি বলে। গায়ে পড়ে উৎপীড়ন করে এক একজন। 'কি হে ভারি চুপচাপ দেখছি আজকাল, আমাদের কিছু বলই না।'

'তার অর্থ?' ওদের দেখে জোর করে তারাপদ হাসতে চেষ্টা করে, ওদের সঙ্গে দেখা হবে ভেবে রাস্তায় বেরোলে তারাপদর মুখ শুকিয়ে যায়।

'তার অর্থ খুবই সরল।' দুর্মুখ বন্ধু দাঁত বার করে হাসল, 'আমাদের তহবিল শূন্য থাকে কি না সব সময়, তাই অন্তরেও ভয় আছে লেগে। দু'মাস বিয়ে করেছ, পিঠে যদি সত্যি তোমার এর মধ্যে এক আধদিনও ডুগডুগি বেজে না থাকে, বলব, ওষুধ করেছ, মন্ত্র পড়ে বশ করেছ বৌকে তুমি।'

হতে পারে! তারাপদ একথায় আর তেমন রাগ করেনি। মন্ত্র পড়ে মানুষকে বশ করা যায় কিনা ভাবছিল সে মনে মনে।

কিন্তু উঠে যাবার সময় বন্ধুটি শেষ হুল ফুটিয়ে দিয়ে গেল। 'রং বদলায় ওরা শুনেছি, রক্ত বদলায় না। পদ্মপুকুর রোডের মেয়ের মেজাজ বুঝতে আরো কদিন সময় নেবে তোমার, ভায়া।'

শান্তনুর স্নান করার শব্দ শুনতে শুনতে কথাগুলি মনে হল এখন তারাপদর। আর তার বন্ধুদের কাউকে এই মুহূর্তে ডেকে বলতে ইচ্ছা হল, মেজাজ যার আছে, সে মেজাজ ফলায়, সংসারের আর দশটি অসুবিধার মতো মাথা ধরার অসহ্য যন্ত্রণা সে সহ্য করে না মুখ বুজে।

বরং আজ শান্তনুকে তার বাজার থেকে ফেরার আগেই তাড়াতাড়ি স্নানের ঘরে চলে যেতে দেখে তারাপদ একটু আরাম বোধ করল।

সত্যি কি ও খুব বেশি চুপচাপ থাকে না। নিজের সুখসুবিধা বা ভালমন্দ ব্যক্ত করতে এ দু'মাসে একদিনও তারাপদ দেখল না এটা কি খুবই আশ্চর্যের নয়!

এর দরুন তারাপদই যে অস্বস্তিভোগ করছে বেশি।

এই নিয়ে, অর্থাৎ শান্তনু কি চাইছে কি চাইল না ভেবে তারাপদ যখনই ব্যস্ত হয়েছে, ইঙ্গিত করতে গেছে, কালো বড় বড় চোখ স্বামীর মুখের ওপর মেলে ধরে ও যেন বোঝাতে চেয়েছে, কেন তুমি অস্থির হচ্ছ, কিছু চাইবার থাকলে সত্যি কি প্রথম দিন এবাড়িতে এসে আমি তোমায় বলতাম না। আমার প্রকৃতি ভিন্ন, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না?

তারাপদ এতটা দেখবে আশা করতে পারেনি। তাই সময় সময় সে বড় বেশি সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে, সন্ত্রস্ত।

রাঁধাবাড়া ঘরগুছানো সেবাযত্ন, একটা চাকর নেই, একলা হাতে সব করছে, খুঁত ধরতে পারবে না কেউ একদিন। আর কত চট্‌পটে, কী অদ্ভুত শৃঙ্খলা সব কাজের। ঘড়ির কাঁটার মত নির্ভুল। হঠাৎ টিনের দরজা ঠেলে শান্তনু সামনে এসে দাঁড়াল। তারাপদ চমকে উঠল। দু'মাসের পরিচয়েও কত অপরিচিত থেকে যায় মেয়েরা, কেমন নতুন অচেনা ঠেকে ওদের শরীর এক এক সময়। টুথব্রাশ ও জিভছোলা কামড়ে ধরা ঝক্‌ঝকে দাঁতের মতো চক্‌চক করছে ওর চোখজোড়া, পাখির গায়ের মতো কালো সদ্যধোয়া চোখ, জল লেগে আছে পালকে। ভিজে আঁচল কোমরে জড়ানো, টস্‌টস করে জল ঝরছে নিটোল নিতম্ব, গোলাপী আভার সুন্দর উরু আর জঙ্ঘা বেয়ে। ঠিক স্নানের পর শান্তনুকে সে আর কোনোদিন দেখেনি।

কিন্তু ব্যস্ত হয়ে গেল তারাপদ অন্য কথা ভেবে।

'এবেলা মাছটা বরং আর না রাঁধলে।'

'অফিসে লেট্ হবে ভয় করছ!' শান্থ হাসল।

শান্থর চোখের মৃদু হাসি দেখেই যেন তারাপদ হাসল, 'হ্যাঁ, তা, তাছাড়া এখুনি স্নান করে এসে মাছ কোটা—'

'তুমি স্নান করে এস, মাছ রান্না হয় কি না হয় দেখতে পাবে।' বাঁ হাতের দু'আঙুলে থলেটা তুলে নিয়ে শান্তনু নিঃশব্দে রান্নাঘরে চলে গেল।

পাড়ার ঘরে ঘরে তখন রান্নার তাড়াহুড়া, ব্যস্ততা। অফিসের রান্নার শব্দে গন্ধে সকাল আটটার বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে তারাপদ অনুভব করল কলতলায় বসে। কেরানী-পাড়ার বৈশিষ্ট্য এটা।

শান্থ পারবে না, ওর অসুবিধা হচ্ছে, তা-ই বা সে ভাবতে গেল কেন, তারাপদ ভাবল, ওর ক্ষমতা ও সহিষ্ণুতার ওপর একি অবিচার করা নয়।

খেতে বসে পাতের সামনে ধোঁয়া-ওঠা মাছের ঝোলের বাটি দেখতে পেয়ে তারাপদ লজ্জিত হল।

আর খেতে খেতে, টের পেল সে, অন্য ঘরে গিয়ে শান্থ তারাপদর জুতো ব্রাশ্ করছে জামা কাপড় ঠিক রাখছে। খাওয়া শেষ করে তারাপদকে আর অপেক্ষা না করতে হয় এসবের জন্যে। অদ্ভুত ত্বড়িদ্‌গতি মেয়ের।

খাওয়া শেষ করে জামাকাপড় পরে তারাপদ অফিসে বেরোবার আগ মুহূর্তে, চৌকাঠের বাইরে পা বাড়াবার সময়, চিরাচরিত প্রথামত আজও বললে, 'এখন থেকে সারাদুপুর তোমার ছুটি।'

'সেই ছ'টার আগে অফিস থেকে একদিনও বুঝি তোমাদের বেরোতে নেই?' শান্তনুও বললে, যেমন রোজ বলে।

'না। আমরা যে মার্চেণ্ট অফিসের—' চোখ তুলে শাস্তনুর মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে তারাপদ থামল। মার্চেণ্ট অফিসের কেরানী, কথাটা আরো ও শুনেছে বলে, নাকি অন্য কোনো কথা হঠাৎ মনে পড়ল, তাই শান্তু তারাপদর মুখের দিকে না তাকিয়ে একদৃষ্টে চেয়েছিল সামনে রকের রৌদ্রের দিকে। তারাপদ লক্ষ্য করল। একটু হেসে পা'টা চৌকাঠ থেকে সরিয়ে এনে বলল, 'দুপুরে ওখানে কি করতে তুমি ?'

'মেজদা অফিস পালিয়ে এসে গেছে দু'টোর সময়, ছোড়্দা ফেরে আড়াইটায়, ওরাই ওদের অফিসের কর্তা কিনা, ভয়ডর নেই। বাবা ফেরেন সাড়ে পাঁচটায়, প্রায় তোমার কাছাকাছি সময়ে। এতবড় সিনিয়র অফিসার। কিন্তু শুনি প্রায়ই বলেন, মনিব যদি বেশিক্ষণ না খাটবে ওদের খাটাবে কি করে, যারা নিচে আছে, কেরানী পিয়ন, অর্দালী লিফ্‌টম্যান, স্টেনোগ্রাফার টাইপিস্ট এমন কি একাউণ্টেণ্ট হয়েও তোমার অফিসে যারা আসে কাজ করতে। ওরা ফাঁকি দেয়, যখন তুমি অফিস ছেড়ে চলে এসো ওরা কিছুই করে না, ছোড়্দা আর মেজদাকে ডেকে বাবা বোঝান এক এক দিন। বাবা এবয়সেও সন্ধ্যা অবধি অফিসে থাকেন।' কালো চোখজোড়া তুলে শান্তনু তারাপদর দিকে তাকালো। তারাপদ মন দিয়ে শুনছে পদ্মপুকুর রোডের বাসার কথা।

'দুপুরবেলা মেজদা সেজদা তাসের আড্ডা জমিয়েছে বন্ধুদের ডেকে এনে। সিগারেট পুড়ছে হরদম টিনের পর টিন। মা যায় ব্রহ্মচারিণী দিদির কাছে বালিগঞ্জে গুরুর কথামৃত শুনতে!'

'তুমি ? ভারি একলা বোধ করতে সে সময় ?' উৎকণ্ঠিত তারাপদ।

জানতে চাইছে বিয়ের আগে একটি মেয়ে দুপুরবেলা বাড়িতে না জানি করত কি।

'আমাদের বাড়ির পিছনের বাগানে একটা হরিতকী গাছ আছে, তুমি দেখেছ? দুপুরবেলাই জায়গাটায় সবচেয়ে বেশি ছায়া হয় ঠাণ্ডা লাগে। কোনোদিন কলেজ থেকে বেলা দু'টোয় ফিরেছি, কোনোদিন তারও আগে। চলে গেছি সেখানে, ঘাসের উপর চুপচাপ বসে থাকতুম। হরিতকীর কাণ্ড বেয়ে নেমে আসত একটা কাঠবিড়াল, রোজ, ঠিক আমার পায়ের কাছে এসে ঘাস খুঁটত, কতদিন ওর সামনে রুমাল ছুঁড়ে মেরেছি, একটু ভয় পায়নি, ছুটে পালায়নি, আমার রুমালের গন্ধ শুঁকত ও, চেয়ে দেখতাম।'

হরিতকীর ছায়ায় ঢাকা বাগানের নির্জন কোণায় বসে দুপুর কাটানোর সুন্দর ছবি কল্পনা করে তারাপদও মুগ্ধ হল। হরিতকী গাছটা মনে করার চেষ্টা করল তারাপদ পদ্মপুকুর রোডের বাসায়।

শানু আবার রকের গায়ে রৌদ্র দেখতে ঘাড় ফিরিয়েছে। তারাপদ নিঃশব্দে এবার রাস্তায় নামল। তারাপদর কানের কাছে বাজছিল, আমার রুমালের গন্ধ শুঁকত ও, ভয় পেয়ে ছুটে পালাত না। একটা কাঠবিড়াল। কি ভীষণ ছেলেমানুষ মন ছিল শানুর এই দু'মাস আগেও। মনে মনে বলল তারাপদ, ট্রামে বসে।

শানুর বাবার কথাও মনে পড়ল তার এখন। 'অফিসার' ছেলেদের কেরানীদের ফাঁকি সম্পর্কে সচেতন করেই তৃপ্তি পান অক্ষয়বাবু, এ অপবাদ দেওয়া ভুল। অন্যদিকে কেরানীদেরও তিনি উৎসাহিত করেন উজ্জীবিত করেন সাহস দিয়ে, আশা জুগিয়ে।

তারাপদকেও অক্ষয়বাবু উৎসাহ দিয়েছিলেন। বিয়ের রাত্রে আবেগে তাঁর কণ্ঠরোধ হয়েছিল।

'বড়লোক,—বড়লোক ছেলেয় আমার ঘেন্না ধরে গেছে। আমি দেখব মানুষ। আমি খুঁজছি সৎ কর্মঠ নম্র উদার একটি ছেলে। না, শান্তনুর জীবন আমি নষ্ট হতে দেব না, দরকার নেই গাড়ি বাড়ি ব্যাঙ্ক-বেলান্সের। মনুষ্যত্বের মাপকাঠি ওসব নয়, তারাপদ।' তারাপদর হাত চেপে ধরে-ছিলেন অক্ষয়বাবু। অক্ষয়বাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন। তারাপদর চোখে চোখে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, টাকার মোহ তাঁর ভেঙ্গে গেছে। শানুর বড়বোন উৎপলা ফিরে এসেছিল ওর স্বামীর ঘর ছেড়ে। হ্যাঁ, ব্যারিস্টার, গুণধর ছেলে নীরদ। বাইরের সবাই জানে, কেবল টাকা নয়, বিদ্যা বুদ্ধি পসার প্রতিপত্তি নিয়ে এমন ঝক্‌ঝকে সুন্দর ছেলে এদেশে বেশি নেই। কিন্তু বাইরের সবাই জানত না, বাইরের কেউ দেখেনি সন্ধ্যা ছ'টা বাজতে নীরদ সদরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে ভিতরে বসে একটি দু'টি বন্ধুকে নিয়ে ড্রিঙ্ক্ করে। একদিন উৎপলা নিজে না গিয়ে চাকরকে দিয়ে কেন মাংসের বাটি পাঠিয়েছিল মদ খাবার ঘরে এই ওর অপরাধ। ব্যারিস্টার বিলিতী শপথবাণী উচ্চারণ করে ছুটে এসে লাথি মেরেছিল উৎপলার পেটে। উৎপলা চলে এসেছিল সেই রাত্রে। জন্মের মতো চলে এসেছিল। ওর পেটে ছিল তিনমাসের সন্তান। abortion হয়ে পরে হাসপাতালে মারা যায়। উৎপলার কাহিনী বলতে বলতে অক্ষয়বাবু জামার আস্তিনে চোখ মুছেছিলেন। নীরদ নাকি বলে বেড়ায় উৎপলা ভয়ঙ্কর বদমেজাজী ছিল। ওর অবাধ্যতা, অতিরিক্ত অহংকার

ও তেজ নাকি ওর জীবন নষ্টের প্রধান কারণ। অক্ষয়বাবু পরে মীনাক্ষীর কথা বললেন। পদ্মপুকুর রোডের মেয়ে। ওর পেটে লাথি পড়েনি, ছিল চাবুকের দাগ। চাওয়ামাত্র ও যতীশঙ্করের হাতে কেন ক্যাশবাক্সের চাবি তুলে দেয়নি, যতীশঙ্করের তখন রেসে যাবার তাড়া। অসময়ে মীনাক্ষীর চুল বাঁধার ঘটা তার সহ্য হয়নি। যতীশঙ্কর এখন বলে বেড়ায় স্বামী সংক্রান্ত সব বিষয়ে নাকি মীনাক্ষীর ঔদাসীন্য ছিল উগ্র। দিন দিন নাকি ওটা বেড়ে চলেছিল। তাই হুইপ করে সে তাড়িয়ে দিয়েছে স্ত্রীকে। মীনাক্ষী কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এসেছিল পদ্মপুকুর রোডে।

অক্ষয়বাবু শেষে মাধবীর কথা বললেন।

এসিড ছুঁড়ে মেরেছিল বিনয়েন্দ্র।

একটা চিনেমাটির ডিশ ভেঙেছিল মাধবী। অপরাধ ওর।

বিনয়েন্দ্র বলে বেড়ায়, শুধু ডিশ নয়, এক ডজন কাচের গ্লাস, রেডিও, ফুলদানি, চাবি দিতে গিয়ে বিনয়েন্দ্রের ঘড়ির ডায়েল, টেবিল পরিষ্কার করার সময় বিনয়েন্দ্রের সুন্দর টেবিল-ল্যাম্প এবং এমনি আরো অনেক কিছু। বিয়ের পরদিন থেকে কেবল ভাঙতে ভাঙতে আসছিল। এমন স্ত্রীর দরকার ছিল না বিনয়েন্দ্রের, এমন মূর্খ মোটাবুদ্ধি মাধবীর। বিনয়েন্দ্র বলে, তার ওপর ওর অগাধ রূপ বিনয়েন্দ্রের কাছে পরিহাসের মত ঠেকত। তাই সেদিন সহ্য করতে না পেরে হাতের কাছের রিভলবার রেখে বিনয়েন্দ্র এসিড ছুঁড়ে মেরেছিল, জলে যাক,—ঝল্‌সে যাক গালের একদিক, গলার একপাশ, ইডিয়টের অত রূপ থাকতে নেই। বিনয়েন্দ্র ওকে অসুন্দর করে

তাড়িয়ে দিয়েছে। সুন্দরের পূজারী সে। মাধবী ফিরে এসেছিল চোখে জল নিয়ে পদ্মপুকুর রোডে।

অক্ষয়বাবু বললেন, 'এত সব খেয়াল, এমনভাবে মেজাজ ফলায় ওরা মেয়েদের ওপর।' না, ঐশ্বর্যে তাঁর আস্থা নেই। তিনি খুঁজছিলেন সাধারণ দরিদ্র মধ্যবিত্ত একটি ছেলে। যার নিঃশ্বাসে অ্যালকোহলের ঝাঁজ নেই, রেসের দপ্‌দপানি নেই মগজে। অথবা নেই বুদ্ধি ও রূপের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ মাথায় নিয়ে সারাদিন ঘরে বসে স্ত্রীকে বিচার করার বিলাস বিভ্রম।

'অল্প দিয়ে জীবন আরম্ভ ভাল।' অক্ষয়বাবু তাঁর নিজের কথাই তুললেন। অল্প থেকেই জীবন আরম্ভ করেছিলেন তিনি। শানুর মা এ সংসারে এসে অক্ষয়বাবুকেই পেয়েছিল প্রথম। তারপর এসেছিল তাঁদের বিত্ত ও বৈভব। কিন্তু সে সব কি তুচ্ছ হয়ে রইল না দু'জনের জীবনে? পতি-পত্নীর নিভৃত আত্মার জগতে? বিত্ত বৈভব না এলেও ওঁরা থাকতেন, চিরদিনই ছিলেন।

'মার স্বভাব পেয়েছে শানু। বড় বেশি ভাবপ্রবণ ওর মন।' অক্ষয়বাবুর গলা ধরে এসেছিল আবার। 'তেমনি নিরীহ নম্র নিষ্ঠাবতী,—যাক, সন্তানের গুণের কথা বাপ হয়ে বলতে নেই বেশি,—হ্যাঁ, পর্ণকুটির। স্নেহ প্রেম আদর থাকলে প্রাসাদের চেয়েও তা সুন্দর, ঐশ্বর্যশালী হয়, তারাপদ, এই আমার বিশ্বাস।'

এর উত্তরে তারাপদ কিছু বলেনি। ট্রামে বসে এখন তার মনে হল, একথার পর তারাপদ কেবল একবার অক্ষয়বাবুর চোখের দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়েছিল।

কিন্তু একথায়ও বন্ধুরা পরে ঠাট্টা করেছে টিপ্পনি কেটেছে। কুম্ভীরাশ্রু। বলেছে সবাই হেসে, অক্ষয় নন্দীর কুমিটোলার চা-বাগান তলিয়ে গিয়ে টাকায় টান পড়েছে। তাই দিশেহারা হয়ে তারাপদর হাতে কন্যা গছিয়েছে, তাড়াতাড়ি করে। তাড়াতাড়ি না করলে ওদের পদ্মপুকুর রোডের মেয়েদের মন বেশি পেকে যায় যে, বয়স হবার আগে ওদের মন পেকেছে চিরদিন। উপায় যখন থাকে না তখন রুই কাতলার আশা ছেড়ে দিয়ে চুনোপুঁটির হাতেও বাপেরা মেয়ে ছেড়ে দেয়, কখনো। মানে চুনো-পুঁটির ভবিষ্যতটিও ঝরঝরে করে দেয় আর কি,—বাপ্‌, কী ভীষণ মেয়ে সব!

উনিশ পার হয়েছে শান্থ। ভাবতে ভাবতে ট্রামের ভিড় ছেড়ে অফিসের পাকা রাস্তায় নেমে এল তারাপদ। ন'টা উনত্রিশের ঝিবুঝিরে রোদে লালদীঘির জল কাঁপছে। অফিস-পাড়ায় রক্তরাঙা একটা অশোক-গাছ। এই আজ সে প্রথম দেখল অফিস-পাড়ায় বসন্ত নামে।

আজ তারাপদর এই প্রথম মনে হল উনিশ বছরেও কত ছেলেমানুষ শান্থ। সেদিনও বাথরুমের জানালা খুলে দিয়ে সকালের ফুটফুটে আলোয় নিরিবিলি স্নান করেছে ও নিতান্তই নির্জনে স্নান করবে বলে। ছবিটা তারাপদর চোখের উপর ভেসে উঠল। আর, এই মেয়ে একটু আগে পরিপাটী করে মাছের ঝোল রান্না করে দিয়েছে তারাপদকে, পান খায় না তারাপদ, লবঙ্গ ও সুপুরীকুচি তুলে দিয়েছে তার কৌটোয়।

লিফ্‌টে উঠবার সময়, হঠাৎ কেন জানি তারাপদর মনে হল, যদি এমন চটপটে না হয়ে একটু কম বুদ্ধির মেয়ে হত শান্তনু, একটু বোকাসোকা, তবে কি—তবে কি। মাধবীর কথাটা মনে হল তার।

আর মনে মনে হাসল তারাপদ। ভাগ্যিস তার অঢেল অবসর নেই আর অজস্র অর্থ যে নিরর্থক রূপ-চিন্তায় অধীর ও উত্তেজিত হয়ে একদিন এসিড ছুঁড়ে মারবে কে-এক বিনয়েন্দ্রের মত। তারাপদ নিতান্তই সাধারণ, অসাধারণ বা অতি-অগ্রসর কোনো নাটক ঘটবে না তার জীবনে, অচিন্তনীয় বা অনভিপ্রেত কোনো ঘটনা, তার ও শাম্বুর মধ্যে,—এই সন্তোষ, এই প্রতিশ্রুতি, জীবনের এই অকৃত্রিম নিবিড়তা সত্যি কি খুব মূল্যবান নয়, অনেক ঐশ্বর্যের চেয়েও লোভনীয় রমণীয়?

আর রমণীয় এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে বসন্তের বাতাসের মতো সুন্দর একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল তারাপদর বুক ঠেলে, লিফ্‌টের আবছা আলোর নিচে সে যখন দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়িয়ে আয়নায় পাঞ্জাবির একটা ছেঁড়া কোণা আঙুল দিয়ে টেনে টেনে ঠিক করছে। হ্যাঁ গরীব সে, কিন্তু ঐশ্বর্য আছে একজায়গায়।

বন্ধুরা কত কি বলে!

বন্ধুরা কি জানে না বুদ্ধির আলো ও রূপের দ্যুতি নিয়ে কেবল হীরে হয়ে জ্বলছে না শাম্বু তার হাতিবাগানের একতলার অন্ধকার ঘরে একলা চুপচাপ। এতক্ষণে থালা ও গ্লাসগুলো ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে তাকের ওপর সাজিয়ে রাখছে সুন্দর করে। ফুলের পাপড়ির মতো আঙুল ক'টিতে হলুদের ছাপ। ঘর দরজা ঝাড়-পোছ করে এটা-ওটা টুকিটাকি কাজগুলো সারতে বেচারার দুপুর কেটে যায়। কলে জল আসে, উনুন সাজিয়ে বিকেলের রান্না চাপাতে আবার ও কত ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

বন্ধুরা তো আর কোনোদিন দেখেনি সিঁড়িতে জুতোর শব্দ হতে শাম্বু

চায়ের জল চাপিয়ে দেয়, অফিস থেকে ফিরে গিয়ে ঘরে পা না দিতে তারাপদ রোজ চা পেয়েছে, পাচ্ছে।

আর তারাপদ তখন তাকিয়ে দেখে ওর কপালে গালে ছোট ছোট ঘামের ফোঁটা, রক্তাভ মুখে গৃহকাজের নিরলস পরিচয়চিহ্ন।

কেরানী-পাড়ায় দুপুরে কাজের চাপ যখন কমে যায় তখন কোন্ মেয়ে লম্বা ঘুম না দিয়ে ওঠে! বা অন্তত পাশের বাড়িতে, স্বামী যখন বাড়ি নেই, একটু বেড়িয়ে আসার শিথিল ইচ্ছায় কে না এক আধদিন বাইরে পা বাড়ায়! আশ্চর্য, অফিস থেকে বাড়ি ফিরে তারাপদ কিন্তু একদিনও দেখল না শান্তনু ঘরে অনুপস্থিত কি ঘুমে অচৈতন্য। নির্ভুল নিয়মে ও মেঝেয় বসে আটা মাখছে কি কয়লা ধরাচ্ছে, নয়ত স্থির অপলক চোখে তাকিয়ে আছে সিঁড়ির দিকে, অপেক্ষা করছিল কি তারাপদ কখন ফিরবে? তার স্বামী?

তারাপদ সুখী নয় বন্ধুদের এই সন্দেহ যাকে ঘিরে, তার কালো অদ্ভুত সুন্দর চোখ দু'টোর কথা ভাবতে ভাবতে তারাপদ অফিসের লম্বা করিডোর পার হয়ে নিজের আসনে এসে বসল।

অফিসেও বন্ধু থাকে। আর তাদের কথার ধরনও সেরকম।

তারা কাজের ফাঁকে ফাঁকে এসে অত্যাচারও করে।

'আজ আবার ভাই লেট্ হল দেখছি।' ডেস্পাচের অতুল। তারাপদ মুখ তুলে দেখল অতুল মিটিমিটি হাসছে।

'বাজার সারতে কেমন দেরি হয়ে গেল।'

'ভাল।' যেন বিশেষ মনঃপূত হল না বন্ধুর এ ধরনের উত্তর শুনে,

'আমরা ভাবছি বৌ বুঝি দেরি করে দিলে।' অতুল এক চোখ ছোট করল।

'বৌ ধরে রেখেছিল বলতে চাও?' মৃদুমন্দ হাসি ছড়িয়ে দিল তারাপদ সারামুখে ইচ্ছে করে।

'না, ধরে আজকাল আর ক'জন রাখে স্বামী যখন অফিসে আসে।' অতুল হঠাৎ মুখ অন্ধকার করল, 'ভাবছি আমরা, বড়লোকের মেয়ে, বেলা অবধি ঘুমিয়ে আছেন হয়ত, তারাপদর অফিসের রান্না বুঝি আজ আর নামল না।'

এ কথার উত্তরেও তারাপদ মিষ্টি করে হাসল, অর্থাৎ বোঝাতে চাইল অতুলের ধারণা কত ভুল।

অতুল চলে যাবার পর তারাপদ গম্ভীর হল। বন্ধুরা কেন এসব বলতে আসে তারাপদ ভেবে পায় না।

বন্ধু নেই এমন কোনো জায়গা নেই কি পৃথিবীতে। ভাবল সে কতক্ষণ চুপ করে।

টিফিনের ঘণ্টায় এল ললিত হাজরা। অশ্লীলতার মহারাজ। লোকটাকে দেখেই তারাপদর ভয় হল। ওকে দেখলে তার কেমন ঘৃণা হয়। আর ক'দিন ধরে একই প্রশ্ন করছে তারাপদর সঙ্গে দেখা হতে।

'বিয়ে করেছ, মোটে দুমাস, ছেলেপুলে নেই, সারাটা দুপুর করেন কি, খোঁজ খবর মাঝে মাঝে নিচ্ছ ত?'

'কেন?' জিজ্ঞেস করে ফেলল তারাপদ আজ আর মিষ্টি একটু হাসল। এসব কথার উত্তরেও মিষ্টি হাসতে হয় এই তারাপদর দুঃখ। 'অফিস

পালিয়ে বৌ কি করে বাড়িতে দেখব গিয়ে ?' হাজরার দোক্তা ছোপানো দাঁতের দিকে তাকায় তারাপদ। হাজরা দাঁত বার করে হাসে কদর্যভাবে।

'ঘুমায় কি ঘুম পাড়ায় খোঁজ খবর নেবে না, বাবুপাড়ার মেয়ে।'

তারাপদ চুপ করে রইল। কী নির্লজ্জ লোকটা!

এক চোখ ছোট করে হাজরা বলল, 'তেল মাখতে ভালবাসে না কেবল গায়ে সাবান মাখে, এলো খোঁপা করে কি আঁটো-খোঁপা, ঘুমোলে নাকের শব্দ হয় কি হয় না, পিঠে তিল আছে কি নেই সব খোঁজ নিচ্ছ না, দেখছ না সব!'

'কেন?' ললিতের অশোভনতা ঢাকবার জন্যে তারাপদকে আবার হেসেই প্রশ্ন করতে হয়। 'অন্যরকম মানুষ নাকি?'

'মানুষ বলছ কি? মাছ। জল থেকে ডাঙ্গায় এসেছে। সেজন্যেই জিজ্ঞেস করি ছটফট করে কেমন, ধরনধারণ কি, চলাফেরা?' তারাপদ চুপ। তারাপদর আর ইচ্ছাই হল না লোকটার সঙ্গে কথা বলতে। তবু তারাপদ মুখে একটা হাসি হাসি ভাব ফুটিয়ে রাখল। হাজরা কত ভ্রান্ত এই সে বোঝাতে চাইল চুপ থেকে।

ললিত হাজরা অভ্রান্ত। হাত নেড়ে চোখ বড় করে ফিসফিসানির গতিবেগ বাড়িয়ে দিয়ে তাই সে প্রমাণ করতে লাগল বারবার।

'আমি হলে নিশ্চিন্ত থাকতে পারতাম না ব্রাদার। শুনছি তো বিয়ের আগে নরম বিছানায় পিঠ রেখে ওরা ইংরেজী নভেল পড়ে, বাবুর্চি খানসামার হাতের রান্না খেয়ে বড় হয়, দাদার বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে, তাস খেলে লম্বা লম্বা দুপুর কাটায়। সেই মেয়ে তোমার ঘরে এসে রাতারাতি বদলে

গেছে, তুমি যখন অফিসে থাকো উনি তখন একলা ঘরে চুপচাপ বসে চাল বাছছেন কি ডাল ভাঙছেন একি বিশ্বাস হয়? এমন কি গুণ আছে তোমার, কী এমন ঐশ্বরিক জিনিস আছে তোমার মধ্যে যে—হেঁ—হেঁ।'

সূক্ষ্ম অবিশ্বাসের রেখাগুলি হাসির ভাঁজে ভাঁজে এখন আরো কুটিল কদর্থ হয়ে উঠল হাজরার মুখে। তারাপদ চোখ নামাল।

'আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারতাম না।' কথাটা তারাপদর কানের কাছে বাজতে লাগল। হাজরা চলে যাবার পরও তারাপদ ভুলতে পারল না।

অবিশ্বাস, মানুষকে অযথা অবিচার করার দুরারোগ্য ব্যাধি ওদের পেয়ে বসেছে। তারাপদ অনেকক্ষণ চিন্তা করল। প্রায় সারাটা দুপুর। তার যদি কেউ বন্ধু না থাকত। ভাবল।

ভাবতে ভাবতে তারাপদর মনে হল সত্যি কি শান্তুর ওপর সে নিজেও অবিচার করছে না। না, অফিস পালিয়ে নয়, এমনি, নতুন বিয়ে করার পর মানুষ যা করে, অন্তত এক আধদিন ছুটি নিয়েও কি সে দুপুরবেলা বাড়ি যেতে পারে না। শান্তনু নিশ্চয় খুশী হত। অতর্কিতভাবে অনিশ্চিত এক মুহূর্তে স্বামী ঘরে ফিরে আসতে পারে বেচারা ভাবতেই পারছে না হয়ত। সন্ধ্যা ছ'টার আগে তারাপদ আজ অবধি ঘরে ফিরেছে কি?

তারাপদ হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়।

বাড়িতে তার জরুরী কাজ। নিশ্চয়। কেরানীরও এক আধদিন কাজ থাকে।

হ্যাঁ, তার স্ত্রী অসুস্থ। ঘরে তো আর দ্বিতীয় পুরুষ নেই, বলল সে ওপরওয়ালাকে। সত্যি, সঙ্গে সঙ্গেই ছুটি মঞ্জুর হয়ে গেল। প্রায় অর্ধেক দিনের ছুটি। এখন বেলা দুটো, বাড়ি পৌঁছুতে একঘণ্টাও লাগবে না। তারাপদ হিসাব করল।

স্ত্রীর অসুখ ছাড়া কেরানীদের ছুটি পাওয়া কত মুস্কিল আর স্ত্রীর অসুখে ছুটি পাওয়া কত সোজা। রাস্তায় নেমে তারাপদ ভাবল কথাটা আর হাসল মনে মনে। অসুখই তো। কাল শান্তুর এমন ভীষণ মাথা ধরেছিল! আজ সকালে অবশ্য আর ওর মাথা ধরেনি, কিন্তু না ধরুক, এখন, এ সময়ে, এমনি এই দুপুরের নিঃসঙ্গতায় ঘরে গিয়ে তারাপদ কি শান্তনুর মাথাটা একবারও বুকের ওপর টেনে নিতে পারে না, স্বামীর কাছে কি ও এটা আশা করে না। সত্যি শান্তু আজ পর্যন্ত মুখ ফুটে কিছু বললেই না।

হাতে টাকা নেই, মাইনের আরো অনেক দেরি, শাড়ির দোকানগুলির পাশ দিয়ে যখন ট্রাম চলছে, কেন জানি তারাপদর খুব ইচ্ছা হল হলুদে-ছোপ-দেওয়া সুন্দর একটা শাড়ি শান্তুর জন্যে আজ কিনে নিয়ে যায়। এমনি। অবশ্য বিয়েতে ও এর চেয়ে অনেক দামি দামি শাড়ি পেয়েছে এবং সংখ্যায় সেগুলি কত তারাপদ সঠিক না জানলেও সেসব কাপড়ে যে বেশ কিছুদিন যাবে তা অস্বীকার করার নয়।

তবু তো, স্বামীর নিজের হাতে কিনে দেওয়া উপহার।

কিন্তু এসব বিষয়েও, সংসারের আর পাঁচটি সুখ সুবিধার মতো, শান্তু যে কত নীরব ও নিরাসক্ত তারাপদ চোখের ওপর দেখতে পায়। শাড়ি গয়না জুতো এত সব পেয়েও যে ও কত সাধারণ ও সহজ হয়ে আছে

প্রথম দিন থেকে তারাপদর মূর্খ বন্ধুরা যদি একদিন এসে দেখতো বাড়িতে। কত সাদাসিধাভাবে চলে শান্তনু।

সাধারণ সংসার দেখে অক্ষয়বাবু ওকে পাঠিয়েছেন।

প্রাচুর্য তিনি চাননি। বিলাসে আস্থা নেই তাঁর।

সাধারণ হয়েই ও থাকবে। মার স্বভাব পেয়েছে মেয়ে।

'অল্প দিয়ে জীবন আরম্ভ করেছিলাম আমরা। বুঝলে তারাপদ। আগে মানুষ পরে বিত্ত এই সত্য আমরা উপলব্ধি করেছিলাম।' কথাটা তারাপদ আবার আবৃত্তি করল।

সেই সত্যই অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে শানু।

গরিব স্বামীর সংসার। তারাপদ দেখছে।

পদ্মপুকুর রোডের যদি কোনো স্বপ্ন লেগে থাকে ওর চোখে এখনও সে তার ছেলেমানুষির স্বপ্ন। ও যে এখনও কত ছেলেমানুষ কথার ধরনে কি টের পায় না তারাপদ। আর সেই কথাগুলো প্রতিবার সমস্ত হৃদয় দিয়ে সে উপভোগ করে। বন্ধুরা সে সব জানে না।

দুপুরে একলা ও কি করে।

এখানে তো আর বাগান নেই বা ছায়ার নিচে নরম মসৃণ ঘাস। এখন একটু কাজের ফাঁকে দুপুরের অলস অবসরে শান্তনু যদি ঘর ছেড়ে একবার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায় তো এক টুক্‌রো ছায়া অবশ্য ও দেখতে পাবে। সূর্য হেলে গিয়ে বারান্দার ওধারটায় পাশের বাড়ির ছাদের ছায়া পড়ে তিনকোণা হয়ে বেলা দু'টোর পর থেকেই। না দেয়ালের দেশে গাছ নেই। কাঠবিড়ালও আসে না। কল্পনার চোখে তারাপদ দেখতে পেল গোটা

দুই তিন চড়ুই যেন এসে উড়ে বসেছে সিঁড়ির পাশে রেলিংটার ওপর। দুপুরে ওরা আসে চৌবাচ্চার ধারে নর্দমার এঁটো ভাত খুঁটে খেতে। কতদিন রোববারে তারাপদ যখন বাড়িতে থাকে একটা দু'টা চড়ুইকে উড়ে এসে বসতে দেখেছে। নিরিবিলি মধ্যাহ্নে।

আশ্চর্যের কিছুই নেই বারান্দার ছায়ায় দাঁড়িয়ে আজ হয়ত শানুর ইচ্ছা হয়েছে, একটা চড়ুইকে হাত বাড়িয়ে আদর করতে। কিন্তু ওরা তো আর ওর পোষমানা কাঠবিড়ালের মত নয় যে রুমাল ছুঁড়ে দিলে সেই রুমালের গন্ধ এসে শুঁকবে। হাত বাড়াতেই চোখের পলকে হয়ত সব উড়ে গেল ফরর্ করে। তথাপি একরকম নাছোড়বান্দা হয়ে শান্তনু ছোটা-ছুটি করছে একটা চড়ুই পাখি ধরবে, যেন ওর জিদ বেড়ে গেছে একটাকে হাতের মুঠোয় নিয়ে আদর করতে। আর খালি বাড়িতে, হোক না সে বৌ, তারাপদ আসছে তো সেই সন্ধ্যা ছ'টায়, চড়ুই ধরবার জন্যে ছোটাছুটি লাফালাফি করতে ওকে মানা করছে কে। খোঁপা খুলে গেছে, আঁচল লুটোচ্ছে মাটিতে, ঘামের বিন্দু কপালে গালে। তারাপদ কল্পনা করল।

ট্রাম থেকে নেমে বড় রাস্তা পার হয়ে গলিতে ঢুকছে যখন তারাপদ ছবিটা মনে মনে আঁকল।

আর অবাক হল সে কেরানী-পাড়ার এখনকার ছবি দেখে।

রাস্তায় কোথাও একটা প্রাণী নেই। চারিদিক শূন্য।

সবগুলো বাড়ির সদর ভিতর থেকে বন্ধ।

যেন পুরুষরা বাইরে গেছে বলে ঘরে বসে বৌরা কি করছে এখন রাস্তার লোক টের না পায় তাই এই আয়োজন, সদর বন্ধের ঘটা।

ফেরীওলা কেউ বাড়ির পাশ দিয়ে গেলে বড় জোর জানালার একটা কবাট খুলে যায়, কাজ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সেটি আবার বন্ধ হয়। এই নিয়ম।

অবশ্য সব বাড়ির রাস্তার দিকে জানালা নেই, তাই সে বাড়ির কবাটও খোলা হয় না। সে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ফেরীওলা ভাবে বুঝি লোকজন কেউ নেই, নয়ত ঘুমিয়ে আছে সব। দিবানিদ্রায় বিভোর।

আর ঘুমন্ত সেই বাড়ি পার হয়ে ফেরীওলা তখন এগিয়ে যায় সামনের বাড়ির দিকে জানালা একটা থাকবে আশায়।

আশ্চর্য এক অনুভূতিতে তারাপদর মন ছেয়ে যায় ভেবে যে তার ঘরে জানালা আছে রাস্তার দিকেই কিন্তু সে জানালা কোনোদিনই খোলা হয় না। দুপুরবেলা বলে নয়, তারাপদ বাড়িতে থাকলেও না। কেননা সেই জানালার তাক জুড়ে শানু তার বিয়ের উপহার পাওয়া সম্ভবতঃ আয়নাটা বসিয়ে রেখেছে এবাড়িতে এসেছে যেদিন সেদিন থেকেই। যেন জানালায় ওর দরকার নেই, ঘরই সব, ঘরের ভিতরে সংসার।

না, একদিন তারাপদ ওকে সদরেও উঁকি দিতে দেখল না। দেখেনি বাইরে কি আছে দেখার জন্যে শানুর এতটুকু আগ্রহ। ও এমন মত্ত এত তন্ময় ঘরের ভিতর নিয়ে। তারাপদর ঘর। হ্যাঁ, এজন্যে তারাপদ তার বন্ধুদের কথায় মনে মনে হাসে,—মাঝে মাঝে।

তাই মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয় তার, যখন শান্তনুর কাছ থেকে সে দূরে সরে আসে, অথচ বন্ধুরাও কেউ নেই, চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা হয় 'একটি স্বামী-স্ত্রীর জীবন বাইরে থেকে তোমরা কি দিয়ে বিচার করবে, কতটুকু ?' গলি ধরে তারাপদ আস্তে আস্তে অগ্রসর হয়। ভাবতে ভাবতে। তারাপদ

সুখী কি অসুখী শান্তনু সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট, তারা দু'জন ছাড়া, যারা বাইরের, সম্পূর্ণরূপে তৃতীয় ব্যক্তি, কি করে বুঝবে! বাইরে থেকে এ জিনিস বোঝা গেছে কখনো?

মনে মনে সে তার অদৃশ্য বন্ধুদের ডেকে বলল, 'তোমরা বড় জোর আমার ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত আসতে পার, কিন্তু তারপর? না, ধরা যাক চৌকাঠ পার হয়ে ঘরের ভিতরেও এসে দাঁড়িয়েছ, একতলার অন্ধকার ঘরের কালচে মেঝেয়। ভাবচো তখন এ কি করে সম্ভব। যে-মেয়ে এখন বিকেলের এই নরম আলোয় বাদাম গাছের ফাঁক দিয়ে চিকরিকাটা রোদের ঝালর মুখে নিয়ে পার্কের বেঞ্চিতে বসে সারসের মতো লম্বা গলা বাড়িয়ে দিয়ে আকাশে তারা ফোটার অপেক্ষা করত এখানে এমন অন্ধকার কোণায় বসে কয়লার ধোঁয়ায় চোখ কানা করতে বসেছে কেন।

এ কি করে সম্ভব। এই প্রশ্নের উত্তর তারাপদ মুখে বলতে পারে না। বলেনি সে বন্ধুদের কোনোদিন।

উত্তর আছে তার মনে।

হ্যাঁ, এ মেয়েও সারসের মতো তার সুন্দর সাদা গলা বাড়িয়ে দেয়। পার্কের বেঞ্চিতে নয়, এখানে, এই ঘরে। তখন সাড়াশব্দ নিভে যায় পৃথিবীর। তখন কান পাতলে মানুষের বুকের রক্তের শব্দ শোনা যায়।

সেই পরিপূর্ণ শান্ত মুহূর্তে একটি উনিশ বছরের মেয়ের নিঃশব্দ গোপন আত্মসমর্পণের স্বপ্নভরা কাহিনী তারাপদ ভাষা দিয়ে কাকে বোঝাবে। কত অসহায় সেখানে শানু।

বৌ পিঠে ডুগ্‌ডুগি বাজাবে! হাসি পায় তারাপদর।

স্বামী স্ত্রীর মাঝখানে তৃতীয় ব্যক্তির স্থান নেই বলেই একটি স্বামী ও স্ত্রী নিয়ে তাদের এত মাথাব্যথা, আশঙ্কা, উদ্বেগ আর অর্থহীন অদ্ভুত সব ইঙ্গিত।

তাই কি সব আশঙ্কা, উদ্বেগ, সন্দেহ ও ভয়কে এখন কুচিকুচি করে কেটে দিয়ে শাস্থ ওর সুন্দর দুটি বাহু বাড়িয়ে চড়ুই পাখি ধরবার জন্যে উত্তাল হয়ে উঠেছে। ভাবতে তারাপদর ভাল লাগল। রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল সে এখন।

বাড়ির সামনের গলিতে সে এসে গেছে। না, একটা ফেরীওলা নেই আজ রাস্তায়। রোদের তাপে বাড়িগুলো ঝিমোচ্ছে। দশ নম্বর এগারো নম্বর বাড়ি পার হয়ে তারাপদ নিজের দরজায় এসে থমকে দাঁড়ালো। লাল একটা শায়া ঝুলছে শাস্থর, আর ওর কালো-ছোপ-দেওয়া শাড়ি। কখন স্নান করে শুকোতে দিয়েছিল। শুকিয়ে মুড়মুড়ে হয়ে শাড়ি শায়া দুপুরের দমকা হাওয়ায় ছাদের কার্ণিসে লুটোপুটি খাচ্ছে। এক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে তারাপদ দেখল। অবাক হল সে, অসময়ে তার সদর খোলা বলে নয়, সাইকেল একটা কা'র চৌকাঠের সঙ্গে ঠেকানো চাবি দেওয়া, রোদ লেগে পেছনের কাচটা রক্তচক্ষু হয়ে জ্বলছে।

এপাড়ায় এমন দামী ঝক্ঝকে সাইকেল কারোর নেই তারাপদ জানে।

দাঁড়িয়ে থেকে সে কপালের ঘাম মুছল।

শাস্থর দাদারা কেউ গাড়ি ছাড়া চলে না।

আর গাড়ি নিয়ে এই ঘিঞ্জি গলিতে ঢোকা যায় না বলে হোক বা ইচ্ছা নেই বলে হোক তারা কেউ এলোই না আজ অবধি এখানে একদিন।

কদাচিৎ কখনো অক্ষয়বাবু আসেন রিক্সায় চেপে মেয়েকে দেখতে।

কে তবে! সাইকেলের ওপর চোখ রেখে তারাপদ কপাল কুঞ্চিত করল। একটু ভাবল।

ইতস্ততঃ করল সে তখুনি বাড়ির ভিতরে ঢুকবে কিনা।

এক পা দু'পা করে তারাপদ চৌকাঠ পর্যন্ত গেল। সাইকেলের মালিক তখন বেরিয়ে এল ঘর থেকে। বাঁ হাতে কপালের চুলগুলো পিছন দিকে সরাতে সরাতে ডান হাতে সাইকেলের চেন্ খুলল তারপর যেমন করে লোকে ঘোড়ায় চাপে তেমনি ক্ষিপ্র দীপ্ত ভঙ্গিতে লাফ দিয়ে সাইকেলে উঠে সোঁ করে বেরিয়ে গেল। একবার তাকালো না গৃহস্বামী দরজায়।

এমন সুন্দর সাইকেল চড়তে অবশ্য তারাপদ এ পাড়ায় কাউকে দেখেনি।

এমন নধরকান্তি প্রিয়দর্শন ছেলে কেরানী-পাড়ায় তার চোখেই পড়ে না।

সাদা ক্রোমের জুতো, গিলে করা আদ্দী, চিকণ দাঁত পাড় কাপড়ের একটা ঝলক এক সেকেণ্ডের জন্যে গলির বুকে ভেসে উঠে মিলিয়ে গেল দুপুরের দিক্‌চিহ্নহীন রৌদ্রে।

তৃতীয় ব্যক্তির মতো, তৃতীয় কোনো পুরুষের মতো যেন তারাপদ তার নিজের চৌকাঠের সামনে দাঁড়িয়ে বাড়ির দিকে মুখ ফেরালো। সদরটা তেমনি হাঁ-খোলা হয়ে আছে।

আস্তে আস্তে সে ভিতরে ঢুকল।

না, চোর বদমায়েস গুণ্ডা কেউ আসেনি। শান্তনুকে সুন্দরভাবে বারান্দার রেলিং ঘেঁসে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তারাপদ নিশ্চিন্ত হল।

খোঁপা ভেঙ্গে ওর পিঠের ওপর পড়েছে, কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম। যেন আঁচল লুটিয়ে পড়েছিল এইমাত্র গুটিয়ে নিয়েছে শরীরে।

চম্‌কে চোখ তুলে তাকালো শাস্থ তারাপদর জুতোর শব্দে।

চড়ুই আজ আসেনি, একটা শালিক চুপটি করে বসে আছে নর্দমার ওপারে পাচিলের ওপর। বেশ খানিকটা দূরে।

তারাপদ দেখে বুঝল।

'ধরতে পারলে না?' মিষ্টি করে সে হাসল একটু, 'রেলিং ডিঙ্গিয়ে এখানে ছায়ায় এসেছিল কি এক আধবার?'

'এই প্রথম।' মিষ্টি করে হাসল শাস্থ, 'আমার বিয়ের পর এই আজ প্রথম এসেছিল দেখতে ও।' স্বামীর চোখের দিকে নয়, পাচিলের দিকেও না। রকের রৌদ্র ও ছায়ার দিকে চোখ মেলে দিলে শাস্থ তন্ময় হয়ে। 'আমি যখন দুপুরবেলা বাগানে গিয়ে বসে থাকতুম ও রোজ গিয়ে দাঁড়িয়েছে চুপ করে পিছনে, এই পল্লব সেন। কিন্তু ওদের বলে আমি আজও বোঝাতে পারলুম না আমি একলা-স্বভাবের, অন্যরকম।'

'তারপর?' একাগ্রচিত্ত হয়ে শুনছিল তারাপদ। স্ত্রীর কুমারী জীবনের কথা শুনতে কা'র না ইচ্ছা হয়।

'তারপর?' হাসল সে শাস্থ যখন চোখে চোখে তাকালো।

'আজ এসেছিল অন্যরকম উপহার নিয়ে।' শাস্থ ফের ঘাড় ফেরালো। 'বলছে তার বোম্বের ব্যাঙ্ক এসেছে কলকাতায়। পল্লব তারাপদবাবুকে মোটা মাইনের এক উঁচুদরের অফিসার করে দিক শাস্থদেবী কি তাতে

রাজী হবে না। একলা-স্বভাবের মেয়ে কি একটা অনুরোধও রাখতে পারে না, একটি বাসনা?'

'কি বলা হল?' তারাপদ তাকালো শালিকটার দিকে। নর্দমার ধারে উড়ে এসে খুঁটে খুঁটে ভাত খায়।

'বললাম আমার স্বপ্ন আমি রাখব, বাবার ইচ্ছাকে নষ্ট হতে দেব না। সারাদিন গরিব স্বামী অফিসে খাটবে আর আমি একলা এই ছায়ায় বসে— এই আমি চেয়েছিলুম।'

শালিকটা উড়ে এসে রেলিঙে বসেছে। শানু নিরাসক্তের মতো চেয়ে রইল।

'ফিরে গেল বুঝি পল্লব?' তারাপদ আস্তে বলল।

'সবাই ফিরে ফিরে যায়, রোজ।' শানু কেমন করে জানি—হাসল শালিকটার পাচিল পার হয়ে উড়ে যাওয়া দেখে। 'আর ওদের ফিরে যাওয়া দেখে আমার কেবলই মনে হয় আমি যেন এখনও তেমনি পদ্মপুকুর রোডের বাগানে বসে আছি, নিরিবিলি চুপচাপ।'

কালো জামের মতো চকচকে চোখ ও স্বামীর দিকে তুলে ধরল।

তুমি অন্যরকম। মনে মনে হাসল তারাপদ, আর মনে মনে বন্ধুদের সে ডেকে বলল, অন্য মেয়েদের মতো স্বামীর ঘর ছেড়ে শানু পদ্মপুকুর রোডে ফিরে গেছে কি। সোনার পদ্মপুকুর রোড ধরে রেখেছে এই মেয়ে এখানেই, এই ঘরে, তারাপদর ছোট স্যাঁতসেতে বারান্দায়।

কিন্তু শানু তখন আর দাঁড়িয়ে নেই। তাড়াতাড়ি মেঝের ওপর বসে পড়ে আশ্চর্য সুন্দর হাত দু'টি বাড়িয়ে তারাপদর জুতোর ফিতে খুলতে লাগল।

অল্প অল্প হেসে পাচিলের দিকে চোখ রেখে তারাপদ বলল, 'কে জানে কাল আবার কি আসে, শালিক না চড়ুই।'

'ওদের দেখে দেখে সারাটা দুপুর আমার এমন অদ্ভুত আনন্দে কেটে যায়।' স্বামীর এক পায়ের জুতো খুলে শান্তু আর একটা জুতোর উপর হাত রাখল।

'তাই কি।' অসহ্য সুখে অদ্ভুত এক আনন্দে তারাপদও প্রায় রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

জুতো খুলে শান্তু স্বামীর জল গামছা এগিয়ে দেয়। কয়লা ভাঙ্গে উনুন ধরাবার। এখন বিকেল হয়ে এল, কলে জল ধরবার সময়।

নায়ক নায়িকা

কী দুর্ভোগ কী অশান্তি!

বস্তুত যদি তাঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় না হত তো তাঁদেরও শান্তি নষ্ট হত না, আমাকেও দুর্ভোগ পোহাতে হত না।

কিন্তু তা কি হয়!

এক পাড়াতে থাকলে দেখা ও পরিচয় হবেই।

মোড়ের গাছতলায় দাঁড়িয়েছিলাম বাস ধরতে সেদিন। দু'জনের সামনে পড়ে গেলাম এবং পরিচয় হল।

ভাদুড়ি তাঁর সুদৃশ্য বেতের ছড়ি আকাশে উঁচিয়ে বললেন, 'ওই তো এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। তা ছাড়া একটু ভিতরের দিকে গিয়ে যে-কোনো একজনকে জিজ্ঞেস করলে বলে দেবে আপনাকে অশোক ভাদুড়ির বাড়ি কোন্‌টা। আসুন একদিন।'

অশোক-পত্নী তাঁর সুন্দর নীলাভ রুমাল ঠোঁটের ওপর ঈষৎ চেপে ধরে বললেন, 'আশ্চর্য, আপনি গল্প লেখেন আর আমরা এত কাছে আছি।'

যেন তাঁদের এত কাছে থাকাতে একটা গল্প সর্বক্ষণ তৈরী হয়ে আছে এমন ভাব নিয়ে মিসেস ভাদুড়ি অল্প অল্প হাসলেন কি। অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে তিনি বললেন, কাল বিকেলে তাঁর বাড়িতে আমার চা খাওয়ার নিমন্ত্রণ রইল। সাহিত্যিক লোক যেন ভুলে না যাই।

মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে ভাদুড়ি বললেন ব্যাঙ্ক করে সময় পান না

তিনি সত্যি, কিন্তু সাহিত্য পড়ার তাঁর নেশা আছে, সাহিত্যিককে কাছে পেলে খুশী হন। একদিন তাঁর বাড়িতে গেলে তিনি কৃতার্থ হবেন।

অনুমান মিথ্যা হল না। উজ্জ্বলা একটা বড় রূপোর থালায় করে একরাশ গরম লুচি কড়াইশুঁটি কপি ভাজা, দুটো ডিমের বড়া ও এক মগ চা আমার সামনে হাজির করে বললেন, 'আমায় নিয়ে একটা গল্প লিখতে হবে আগেই বলে রাখছি।'

'হা—হা।' ওদিক থেকে প্রকাণ্ড হেসে ঢিলে পায়জামা পরা ভাদুড়ি সামনে এসে দাঁড়ান। সোনার সিগারেট কেইস আমার সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'আমার চেয়ে তুমি সুন্দরী বেশি বলে কি মনে কর তোমার গল্পে তিনি আগে হাত দেবেন, কখ্খনো না, আমায় নিয়ে একটা গল্প লিখুন সাহিত্যিক, খুব ভাল গল্প হবে।'

বিরাটকায় কালো ভল্লুকের মত লোমশাবৃত ভাদুড়ির পাশে উজ্জ্বলাকে জ্যোৎস্নার রেখার মত ফুটফুটে পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছিল।

'আমায় নিয়ে লিখলে একটা গল্প হবে না শুধু এপিক উপন্যাস হবে, এত ইন্‌সিডেন্স এত হেপেনিংস্ জীবনে।' ভাদুড়ি স্ত্রীকে আড়াল করে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন।

'ছাই। তুমি বোঝ তুমি জান শুধু ব্যাঙ্ক আর তোমার ব্যাঙ্কের স্ট্রংরুম্‌টা। অই তো রাতদিনের কথা চব্বিশঘণ্টার চিন্তা, শুনছি। কী আর তেমন ঘটনা আছে সেখানে যে রাতারাতি ওই নিয়ে একটা গল্প ফাঁদা চলে। সরে দাঁড়াও আমি ওঁকে পাখাটা খুলে দিচ্ছি।' উজ্জ্বলা

পৃষ্ঠা তিন

পাখা খুলে দিতে তাঁর পরীর ডানার মত শুভ্র সুন্দর হাত সুইচ্‌বোর্ডের দিকে বাড়িয়ে দেন।

ভাদুড়ি এবার ঈষৎ গম্ভীর হয়ে বলেন, 'তুমি দামী শাড়ি হীরের আংটি পরছ আর ঘরে থেকে ভাল ভাল খাদ্য খেয়ে সুন্দর হচ্ছ বলে যে একটা প্রথম শ্রেণীর গল্পের নায়িকা হবে আমি বিশ্বাস করি না, কি বলেন গল্পলেখক ?'

মুখে কিছু না বলে শুধু হাসলাম এবং আড়চোখে উজ্জ্বলার হাতের হীরের আংটিটা দেখে নিয়ে ভাদুড়ির সোনার কেইস থেকে একটা সিগারেট তুলে নিলাম।

এদিকে চায়ের টেবিলে দাম্পত্য কলহের ঝড় বইতে লাগল। প্রথম-দিনই এই ঘটনা।

'গল্পের মালমশলা তোমার মধ্যে ছিঁটেফোঁটা নেই।'

'সীতাংশুবাবু তোমায় নিয়ে যদি কখনো গল্প লিখতে ট্রাই করেন সেটা নিছক পণ্ডশ্রম হবে, আমি দু'কলম লিখে বলে দিতে পারি।' সুন্দর বাহুযুগল বঙ্কিম করে উজ্জ্বলা স্খলিত খোঁপা ঠিক করতে থাকেন। ঝগড়ার সময় মেয়েদের মাথার খোঁপা ঢিলে হয়ে ঝুলে পড়ে শাস্ত্রের বাক্য।

এবং ভাদুড়ি, আমার একটা সিগারেট শেষ না হতে পর পর তিনটে সিগারেট টেনে শেষ করে জ্বলন্ত টুক্‌রোগুলো ঝপাঝপ ছাইদানির জলে নিক্ষেপ করে আমায় বারবার পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, তাঁকে নিয়ে আগে একটা গল্প লেখা হোক, ভাদুড়ির অনেক দিনের ইচ্ছা, এবং সাহিত্যিক যদি ইচ্ছা করেন উজ্জ্বলাকে নিয়ে না হয় পরে একটি গল্পে হাত দিক, ভাদুড়ির তাতে উৎসাহ নেই। ও একটা গল্পই হবে না।

পরের গল্প শোনার মত নিজেকে গল্পের মধ্যে দেখা, দেখতে চাওয়ার আগ্রহ যে কত প্রবল আমাদের পাড়ার ব্যাঙ্কার অশোক ভাদুড়ি ও তস্য পত্নীর মধ্যে তা আর একবার আবিষ্কার করে দু'জনকে নিয়ে দুটো গল্প লিখব প্রতিশ্রুতি দিয়ে পুরো তিনবাটি চা ও তদুপোযোগী প্রচুর খাদ্য খেয়ে এবং রাশি রাশি সিগারেট পুড়িয়ে সেদিন দু'জনের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

উঁহু। এক গল্পে দু'জন থাকলে চলবে না। উজ্জ্বলা দ্বিতীয়দিন আপত্তি করলেন।

ভাদুড়ি হেসে বললেন, 'আমাদের দু'জনের মধ্যে একরকম অর্থাৎ কমন্ থিঙ আপনি কি পাচ্ছেন যে, ওকে না হলে আমার গল্প হবে না। ওসব আইডিয়া ছেড়ে দিয়ে আপনি অন্যভাবে চিন্তা করুন, সীতাংশুবাবু।'

'ওর তরকারীতে বেশী ঝাল খাওয়া অভ্যাস, শীত পড়তে মাথা অবধি লেপে ঢাকা দিয়ে শোয়া স্বভাব, সিনেমা দেখতে ভালবাসে—অর্থাৎ যেগুলো আমার রুচির সম্পূর্ণ বিপরীত, সুতরাং—' উজ্জ্বলা প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বললেন, 'ওকে আমাকে মিলিয়ে নিটোল একটা গল্প হবে আশা করছেন কেন?'

'রিয়্যালী,' ভাদুড়ি উচ্চ হেসে বললেন, 'আমি রুমালে কড়া সেন্ট ঢালি আর উজ্জ্বলার রুমালে কোনোরকমে সেই গন্ধ এতটুকু লাগলে সাতবার সেটা ও ড্রাইংক্লিনিং থেকে ধুইয়ে আনে, রেডিওর 'আজকের খবর' শুরু হলে আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়, 'আধুনিক গানে'র আসর বসতে উজ্জ্বলার মাথা ধরে, কাজেই—'

পৃষ্ঠা পাঁচ

দু'জনের চোখের দিকে তাকিয়ে আমি হাসতে থাকি। সত্যি তো এই দম্পতিকে একটি গল্পে একরকম করে ফোটাতে যাওয়া বিপজ্জনক হবে, ভাবি।

'আমি সেন্টিমেণ্ট ভালবাসি না, ও বরং—' ভাদুড়ি বলতে যাচ্ছিলেন, তীক্ষ্ণকণ্ঠে উজ্জ্বলা বললেন, 'নিশ্চয়ই না বরং তার উল্টো, কোনো কোনো ব্যাপারে ও এমন অস্থির হয়ে পড়ে যে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না।'

ভাদুড়ি অস্থির না হয়ে ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'বেশ তো, সবে পরিচয় হল, দু'দিন আসা যাওয়া করুন এবাড়ি। কে কোমল কে বা কঠিন গল্পলেখক আপনার চোখে তা ধরা পড়বে।'

বললাম, 'তাই, এখন এই নিয়ে দু'জন ঝগড়া করবেন না।'

সেদিন আর হাল্কাভাবে আপ্যায়ন নয়। চা ডিমের বড়ার পরিবর্তে পায়েস পেস্তার বরফি রাজভোগ রসকদম্ব এল।

প্লেটগুলোর দিকে তাকিয়ে ভাদুড়ি মৃদু হেসে বললেন, 'তার চেয়ে পোলাও ফাউল কারি হলে পার্টি জমত ভাল। গল্পের আসরটা আরো ঘন হত।'

ভুরু কুঁচকে উজ্জ্বলা বললেন, 'না ওসব বিলাতী কায়দায় বাংলা দেশের গল্পলেখককে রোজ আদর করা কেন।'

'তাই গল্পলেখককে মিষ্টান্ন খাইয়ে মিষ্টি একটা পরিবেশ গড়ে তুলছ ?'

'তাই না হয় করলাম তাতে দোষের কি।' উজ্জ্বলা চামচ দিয়ে একটু পায়েস নিজের মুখে তুলে আমার দিকে তাকালেন।

'তাই বলে তোমায় নিয়ে যদি তিনি কোনোদিন গল্প লেখেন তার সবটাই মধু হবে তা-ও ভেবো না।' রাজভোগে কামড় বসিয়ে ভাদুড়ি উচ্চরবে হাসেন।

'তা না হলেও তোমার মত কসাই চরিত্র ফুটবে না আমার,—সারাদিন কেবল মাটন্ আর ফাউল আর বীফ্ আর হ্যাম্। এত মাংসও তুমি খেতে পার!' ঠোঁট বেঁকিয়ে এবং দাঁতের শব্দ করে এমনভাবে উজ্জ্বলা মাংস কথাটা উচ্চারণ করলেন যে গল্পলেখক হয়ে আমি তার ষোলআনা উপভোগ করলাম।

'হয়তো খাওয়াটা আমার হিংস্র কিন্তু হৃদয় ফুলের মত কোমল, তোমার খাওয়া মধুর রসে মাখা কিন্তু হৃদয় নামক জিনিসটি যে রেজারের ব্লেডের মত ধারালো ক্রুয়েল্ হয়ে আছে না তা-ই বা কে জানে!'

'তা আর তোমাকে বোঝাতে হবে না, গল্পলেখক নিজের চোখেই দেখবেন কে কি।' বলে উজ্জ্বলা বাঁহাতে সাঁড়াশি দিয়ে তুলে একটা রাজভোগ আমার প্লেটে ছেড়ে দিলেন। 'খান আপনি শুধু কথা গিলছেন, সাহিত্যিক।'

সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে দু'জন অবশ্য আর ঝগড়া করলেন না। বিদায় দিতে এসে দু'জনই আমার হাত ধরে করুণ গলায় বললেন, 'গল্প চাই, বুঝলেন সাহিত্যিক,—আমায় নিয়ে একটা গল্প লিখতে হবে আপনাকে।'

এত খাওয়া ও খাতির দিয়ে তাঁরা যে ক্রমশ আমাকে সাংঘাতিকরকম ঋণী করে তুলছেন দু'বার সেকথা উল্লেখ করে যাতে দু'জনকে নিয়ে

দু'টো ভাল গল্প তাড়াতাড়ি হয়ে যায় তার চেষ্টা করবার প্রতিশ্রুতি রেখে সেদিনও চলে এলাম।

বস্তুত গল্পের কথা চিন্তা করতে উজ্জ্বলার দামী শাড়ি হীরের আংটি, ওদের বিশাল আকাশ রঙ বাড়ি, মৌসুমী ফুল ছিটানো উঠোন ও ভাদুড়ির প্রতি-মুহূর্তে টাকা আধুলি পুড়িয়ে ফেলা অর্থাৎ দামী সিগারেটগুলো দু'চার টান্ দিয়ে ফেলে দিয়ে নতুন আর একটা ধরানোর ছবির সঙ্গে সেই ছবিটাই আমার চোখের সামনে বেশি ফুটে উঠল। দু'জনের দু'টো গল্পের মধ্যে হয়ে উঠতে চাওয়ার অদম্য বাসনা। যা আমায় ভাবিয়ে তুলল রীতিমত। না এ শুধু বিলাস নয়। একটা ভাল গাড়ি কি দামী পিয়ানো রাখার ইচ্ছার সঙ্গে এই ইচ্ছাকে একপাতে ফেলা যায় না।

ভাদুড়ির চল্লিশ পার হয়েছে লক্ষ্য করেছিলাম সেদিন। উজ্জ্বলার তুক্‌তুকে পালিশ গালের নিচে থুতনির পাশে রেখা জেগেছে দেখেছি। যেন সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সমৃদ্ধির পূর্ণতায় এসে হঠাৎ খেয়াল হল দু'জনের আমরা কি আমরা কে তা তো জানা হ'ল না। একটা গল্প, একটা গল্পের ভিতর দিয়ে ফুটিয়ে দিন সাহিত্যিক দু'জনের সঠিক প্রকৃতি, না হলে শান্তি পাচ্ছি না। তাই কি? গল্পের জন্যে আমি ভাবনায় পড়ে গেলাম।

তৃতীয় দিন আসর জাঁকালো হল বেশি।

গুডফ্রাইডে, কাজেই ব্যাঙ্ক হলি'ডে।

আহারটা সেদিন ভাদুড়ির ইচ্ছানুযায়ী পোলাও মাংস হল। সঙ্গে আলুবখ্‌রার চাট্‌নি।

আ, উজ্জ্বলার সেসব রান্নাও চমৎকার।

খাওয়ার পাট সেরে তিনজন গল্প করতে বসলাম। আমি ও ভাদুড়ি একটা শোফায়। দু'জন সিগারেট ধরিয়েছি। সামনে আর একটা শোফার প্রায় সবটা জুড়ে গা এলিয়ে দেওয়ার মতন করে বসে উজ্জ্বলা পান চিবোচ্ছিলেন। কস্তূরীর গন্ধ বেরুচ্ছিল মনে হয় তাঁর মুখ থেকে।

গল্প করার আসর বৈকি।

দরজা জানালায় চাঁপা রঙের পর্দাগুলো মৃদুমন্দ বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছিল।

বেশ মেজাজের সঙ্গে ভাদুড়ি বললেন, 'আমার গল্পটা লেখা হয়ে যাক আপনাকে একটা ভাল জিনিস প্রেজেণ্ট করব।'

'কি আর প্রেজেণ্ট করবে তুমি!' উজ্জ্বলা ঘাড় সোজা করে বসলেন। 'বড়জোর একটা বিলাতী কলম।'

'তুমি কি প্রেজেণ্ট করবে শুনি, যদি তোমায় নিয়ে গল্প লেখা হয় লেখককে একটা কিছু দিয়ে সম্মান করতে হবে তো?' ঈর্ষাকাতর দৃষ্টিতে ভাদুড়ি স্ত্রীর দিকে তাকান।

'আমি তাঁকে উপহার দেব আমার এই হীরের আঙটি।' হীরকের মত কঠিন হেসে উজ্জ্বলা প্রত্যুত্তর দেন।

আমার বুকের ভিতরটা কাঁপছিল। আ, এই মুহূর্তে একটা গল্প আসছে না কেন।

কিন্তু ইচ্ছা করলেই কি গল্প আসে। গল্প কারুর ইচ্ছার দাস নয়। কাজেই তখনকার মত গল্প না ভেবে গল্পের দাম দেওয়া নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া দেখতে লাগলাম। বাইরে চৈত্র দুপুরের রোদ সোনা হয়ে ঝরছিল উঠোনময় মৌসুমী ফুলের ঝাড়ে।

একটা গল্পের জন্যে তাঁরা আমায় কী না দিতে প্রস্তুত। কলম, আঙটি, ড্রয়িং রুম সাজাবার ফার্নিচার, গাড়ি, কি একটা বাড়ি করার মতন টাকাই হয়তো।

শেষ বীট কে দিলেন জানি না। এক সময় দেখি দু'জনেই চুপ করে আছেন, ঝিমোচ্ছেন।

এত খেয়ে এবং এমন আরামে বসে থেকে আমারও ঘুম পেয়েছিল।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না।

একটা শব্দে তিনজনের এক সঙ্গে ঘুম ভাঙল। তিন জনই চোখ মেলে দেখি মাথার ওপর প্রকাণ্ড একটা ভোমরা ভীষণ শব্দ করে ঘুরপাক খাচ্ছে।

পতঙ্গ দেখে ভাদুড়ির ভয়ের ভাবটা কাটল। বেশ একটু ভয় পেয়ে তিনি চমকে চোখ মেলেছিলেন। এইবেলা হেসে ফেললেন।

'ঘুমের মধ্যে যেন শুনছিলাম এটম বোমা ফাটছে।'

ভয় না পেলেও বিদ্‌ঘুটে আওয়াজে ঘুম ভেঙে যাওয়াতে উজ্জ্বলা বিরক্ত, চেহারা দেখে বোঝা গেল।

মাধবী বিতান থেকে উঠে আসা কালো কুচকুচে ভ্রমরটাকে দেখে ঈষৎ হাসলেন।

'দুষ্টু, আর এদিকে আমি স্বপ্ন দেখছিলাম নিচে বাগানে মালী কাজ

করছে কোথা থেকে যেন গোঁ গোঁ শব্দ করে একটা ষাঁড় ছুটে এসে ওকে এই মারে তো সেই মারে। উঃ কী ভীষণ গর্জন।'

শুনে ভাদুড়ি আরো বেশি শব্দ করে হাসলেন। 'আপনি, আপনার কি মনে হয়েছিল সাহিত্যিক ?'

আমি নীরব। তখুনি কোনো উত্তর মুখে এল না। কেননা, ঠিক সেই মুহূর্তে বুঝি আমার মাথায় গল্প এসে গেছল।

এঁদের হাসি ও কথা শুনে ভোমরাও আর ড্রইং-রুমে থাকতে চাইলে না, জানালা দিয়ে ছুটে পালিয়ে বাগানে নেমে গেল।

যেন শব্দটা হঠাৎ মুছে যাওয়াতে দু'জনেই আবার একটু অপ্রস্তুত, যে পথে ওটা পালিয়েছে ফ্যালফ্যাল করে সেদিকে তাকিয়ে আছেন, লক্ষ্য করলাম। গল্প লেখার সন্ধানী মশাল জ্বালিয়ে আমি সতর্কভাবে পা বাড়াই।

'যা-ই বলুন মিসেস ভাদুড়ি, আপনাদের এমন সাজানো সুন্দর বাড়ি, কিন্তু ভয়ানক খালি খালি ঠেকছে ঘর-দুয়ার। এ বাড়িতে একটিও শিশু দেখছি না। কেমন চুপচাপ চারদিক।'

উজ্জ্বলাকে দেখা শেষ করে আমি ভাদুড়ির চোখের দিকে তাকাই। 'কি বলেন, মিঃ ভাদুড়ি।'

'এই রে! এই বেলা গল্পে হাত পড়েছে। উজ্জ্বলা বলো, তোমাকে নিয়েই এ গল্প লিখবেন তিনি, সাহিত্যিককে বলে দাও কেন তুমি মা হতে চাওনি।' ভাদুড়ি আর তত জোরে হাসলেন না।

উজ্জ্বলা বললেন, 'কেন, তোমায় নিয়েও সুন্দর একটা গল্প লেখা চলে। তুমিও তো বাপ হতে চাইলে না।'

সোনার সিগারেট কেইস থেকে একটা সিগারেট তুলে নিয়ে আমি তাতে অগ্নিসংযোগ করলাম।

'না না', যেন দু'জনকে অভয় দিয়ে আমি তৎক্ষণাৎ বললাম, 'এ তো কমন থিং, দু'জনেই জড়িত, কাজেই শুধু একজনকে নিয়ে এই গল্প লিখব সে ভয় নেই,—তাছাড়া সাবজেক্টটা বড্ড পুরানো। এমনি, প্রতিবেশী বন্ধু হিসাবে ধরুন জিজ্ঞেস করছি, কারণ কি।'

'কারণ আর কি, মশাই', বেশ একটু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ভাদুড়ি বললেন, 'শরীরের রক্ত জল করে পয়সা করব, দু'জন খাব-দাব ভোগ করব। খামকা মানুষের মুখ বাড়িয়ে লাভ কি। ধরুন, ভগবান না করেন, এই সংসারে ছেলেমেয়ে এল, আর ওরা নাবালক থাকতে আমি চোখ বুজলাম, এমনি তো মশাই ব্লাড-প্রেসারে ভুগছি, কি কাল আমার ব্যাঙ্ক ফেল পড়তে পারে, জমানো টাকা আর ক'পুরুষ খেতে পারে, তখন? জেনে শুনে তাই এসব ঝুঁকি নিইনি।'

'আমি মশাই ওই ফিজিক্যাল কষ্ট সহ্য করতে পারব না বলে এড়িয়ে চলছি, আর কিছু কারণ নেই।' উজ্জ্বলা ঈষৎ রক্তনয়নে আমার দিকে তাকান। 'এই নিয়ে লিখতে গেলে গল্প তেমন জমবে কি।'

ভাদুড়ি দুই চোখ বড় করে সিগারেট ধরান। দু'জনই একটু বেশী গম্ভীর।

আমি, যেন প্রসঙ্গটা তুলে অপরাধ করেছি, সেইভাবে অপরাধ ক্ষালনের জন্যে আরো দু'বার মাথা নেড়ে বললাম, 'ও একটা বিষয়ই নয়, আজকাল এই নিয়ে কে আর গল্প লিখছে।'

'ছেলে বলে ছেলে, ও তো বাড়িতে একটা কুকুর রাখতে নারাজ।' উজ্জ্বলা আঙুল দিয়ে স্বামীকে দেখান।

অল্প হেসে বললাম, 'হ্যাঁ, একটা কুকুর রাখলে পারতেন, অত্যন্ত খালি খালি লাগে, শুধুই আপনারা দু'জন।'

নাক দিয়ে একরাশ ধোঁয়া বার করে ভাদুড়ি প্রথমে স্ত্রীর দিকে তারপর আমার দিকে তাকান। 'রিস্ক। কাল কোন কারণে কুকুরটা পাগল হয়ে গিয়ে আপনাকে কামড়াতে পারে। তখন আপনার জীবন বিপন্ন হবে। ও পশু, কিছু বোঝে না। আপনি মানুষ হয়ে মশাই এই বিপদের ঝুঁকি নিচ্ছেন কোন্ আইনে! ট্রাম বাস ইলেকট্রিক আগুন চোর ডাকাত মিলিয়ে শহরে রোজ এ্যাকসিডেণ্ট কিছু কম হচ্ছে নাকি যে জেনে-শুনে আর একটা এ্যাকসিডেণ্ট-এর রাস্তা খুলে রাখব বাড়িতে?'

আমি উজ্জ্বলার চোখের দিকে তাকালাম।

'আমার, সত্যি বলতে কি, সাহিত্যিক, ঘেন্না করে কুকুর বেড়াল। এ্যাকসিডেণ্ট ফ্যাকসিডেণ্ট কেয়ার করি না যদিও, বড্ড ইতর বড় নোংরা।'

'বলে কি না কুকুর। সেবার বাড়িতে আমার ভাগ্নে একটা ময়না রেখে গেল। ছোঁড়া রসিক। রথের দিন বৌবাজার থেকে নগদ আড়াই টাকা দিয়ে পাখিটা কিনে এনেছিল। এখানে বারান্দায় খাঁচাশুদ্ধ ওটাকে ঝুলিয়ে রেখে যাবার সময় বলে গেল, মামাবাবু মামিমা, তোমাদের ছেলেপুলে নেই, আমার এই ভাইটিকে দিয়ে গেলাম, একটু আদর-যত্ন করো।'

কথা শেষ করে ভাদুড়ী টেনে টেনে হাসেন।

গম্ভীর আবহাওয়া একটু তরল হয়েছে দেখে খুশি হয়ে গলা পরিষ্কার করে তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করলাম, 'কোথায় সেই ময়না, দেখছি না তো—'

'কোথায় সেই ময়না।' ভাদুড়ির গলা আবার মোটা হয়ে এল। 'মশাই বোম্বে মেইল ডিরেলড্ হলেও এত আওয়াজ হয় না, রাত্রে শালা এমন বিদ্‌ঘুটে কড়কড়ে গলায় ডেকে উঠত। দু'দিন আমি ঘুমে থেকে ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠেছি।'

ভাবছিলাম ভাদুড়ি কেন এত টাকাপয়সা এমন অগাধ সুখের মালিক হয়েও একটা ছোট গল্পের নায়ক হতে এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

অতি কষ্টে হাসি সংবরণ করলাম।

'পাখিটাকে ভাগ্নের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন বুঝি?' বললাম, 'না আর কেউ নিয়ে গেল!'

'পাঠালেই কি আর ও সেখানে থাকে।' ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে উজ্জ্বলা গম্ভীরভাবে উত্তর করলেন, 'দশ দিনে বেশ পোষমানা হয়ে গেছ্ল। তাছাড়া সার্কুলার রোড থেকে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট খুব দূরও না। দু'দিন ময়নাকে ওবাড়িতে রেখে আসা হল, দু'বারই শিকল কেটে পালিয়ে এসেছে এখানে।'

উজ্জ্বলার চোখের রং দেখে হঠাৎ মনে হল এর সবটাই বুঝি নিরবচ্ছিন্ন সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসপ্রিয়তায় প্রখর নয়, যেন কোথায় একটু মেঘ আছে, স্নেহরসের ছিটেফোঁটা বাষ্প। আমার বুকের ভিতরটা রীতিমত ছলছলিয়ে উঠেছিল। রুদ্ধস্বরে প্রশ্ন করলাম, 'তারপর?'

'পাখিটা দেখতে সুন্দর ছিল রাখা যেত,' উজ্জ্বলা বললেন, 'কিন্তু উপায়

কি! দু'দিনেই আমার ঘরদুয়ার যা নোংরা করল। ধরা গেল না তাই খাঁচায় পুরে রাখা আর সম্ভব হল না। শেষ দু'দিন সারা বাড়ীতে উড়ে উড়ে এই কাণ্ডটি করল।'

'একটা বাল্‌ব ভেঙ্গেছে সেটাও বলো।' ভাদুড়ি স্ত্রীর দিকে না তাকিয়ে আমাকে বললেন, 'সিঁড়ি দিয়ে আমি উঠছিলাম। ব্যাটা কখন যে উড়তে উড়তে সেখানে গিয়ে দেয়ালে বাড়ি খেয়ে প্যাসেজের বাতির উপর ছিটকে পড়ল, উঃ এক চুলের জন্যে সে দিন বেঁচে গেছি, বাল্‌বটা ছিঁড়ে আমার মাথায় পড়ত।

লম্বা একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে নতুন সিগারেট ধরাই।

'ওটাকে মারতে গিয়ে তুমি আর একটা এ্যাকসিডেণ্ট বাধিয়েছিলে সেটাও বলো।' উজ্জ্বলা আড়নয়নে স্বামীকে দেখে আমার দিকে তাকিয়ে নীরবে হাসেন।

একটা নিরীহ পাখিকে মারতে যাওয়ার কাহিনী শোনার ইচ্ছা আমার আদৌ ছিল না। তথাপি প্রশ্ন না করে পারলাম না।

'কি রকম?'

'পেন্‌নাইফ খুলে ছুঁড়ে মেরেছিল ময়নার দিকে।' উজ্জ্বলা বললেন, 'দেয়ালে বাড়ি খেয়ে ছুরিটা প্রায় ওঁর কপালে এসে লেগেছিল, কি বুদ্ধিমান বুঝুন একবার!'

ভাদুড়ি মাথা নেড়ে নিজের দোষ স্বীকার করলেন। রাগের সময় তিনি বুদ্ধি ঠিক করতে পারেন নি, অথচ উজ্জ্বলা কত সহজে কাজটি সম্পন্ন করলেন।

'কিভাবে?' ঢোক গিলে আমি দু'বার দু'জনের মুখের দিকে তাকাই।

'ছাতুর সঙ্গে আর্সেনিক মিশিয়ে দিয়েছিল উজ্জ্বলা।' মোটা খস্‌খসে গলায় কথাটা শেষ করে ভাদুড়ি আবার সিগারেট ধরালেন।

হয়তো আমি অতিমাত্রায় নীরব হয়ে আছি দেখে উজ্জ্বলা তাড়াতাড়ি বলে শেষ করলেন, 'ওসব কুকুর পাখি রাখা আমাদের পোষায় না, ওরা বাইরে সুন্দর, দূর থেকে ভালো।'

চৈত্রের রোদ বাঁকা হয়ে গেছে।

একফালি রোদ জানালা গলিয়ে এসে উজ্জ্বলার ঘাস-রং চটির ওপর পড়েছে, এক আঁজলা পড়েছে অদূরে পিয়ানোর ওপর। হাতির দাঁতের ছোট্ট তাজমহলটা লাল রোদ গায়ে মেখে অপরূপ হয়ে উঠেছে। আলস্য ভঙ্গের চেষ্টায় শিরদাঁড়া সোজা করে হাই তুলে বললাম, 'চলি আজ, অনেকক্ষণ গল্প করা গেল।'

'আমাদের গল্পের কথা ভুলছেন না তো!' স্বামী-স্ত্রী এক সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেন।

বললাম, 'ভুলিনি সারাক্ষণই ভাবছি।'

চলে আসব, বাধা পেলাম।

ভাদুড়ি চীৎকার করে ওঠেন। উজ্জ্বলা শোফা থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ান।

বস্তুতঃ ওটা ওখানে কি করে মাথা গলাতে পারল ভেবে পেলাম না। এমন পরিচ্ছন্ন তকৃতকে ঝক্‌ঝকে সুন্দর কার্পেট-মোড়া ড্রইং-রুমে কদাকার একটা আরশোলা দেখলে কার না রাগ হয়!

ঘৃণায় উজ্জ্বলা নাসিকা কুঞ্চিত করে ভাদুড়ির দিকে তাকালেন।

'তাকিয়ে দেখছ কি, ওটাকে ধর। এত ফ্লিট ফিনাইল লাইজলের পরেও কিনা আমার ঘরে—'

স্ত্রীর ধমক খেয়ে বাঘ-শিকারীর বিক্রম নিয়ে ভাদুড়ি হুড়মুড় টিপয়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে বাঁ হাতের মুঠোর মধ্যে আরশোলাটাকে চেপে ধরেন। কার্পেট ছেড়ে টিপয় বেয়ে ওটা উঠছিল।

আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'চটকে যাবে ছেড়ে দিন, জানালা গলিয়ে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিন, আপদ যাক।'

'আপনি সাহিত্যিক কি না, তাই একথা বলতে সাহস পাচ্ছেন, এতটা ওভারলুক করছেন এসব।' উজ্জ্বলা বেশ একটু বিরক্ত হয়েছেন আমার কথায় টের পেলাম।

'ক্যারিয়ার নাম্বার ওয়ান। মেডিক্যাল রিপোর্ট এরাই কলকাতায় সবচেয়ে বেশি যক্ষ্মা কলেরা প্লেগ ছড়াচ্ছে।' ভাদুড়ি উত্তেজনায় কাঁপছিলেন। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বলো কি করব এখন, ব্যাটাকে কি করে নিধন করা যায় বুদ্ধি দাও।'

উজ্জ্বলা এক সেকেণ্ড ভাবেন। কিন্তু ততক্ষণ ধৈর্য থাকে না ভাদুড়ির।

'পুড়িয়ে মারব শালাকে।' বলে অ্যাশট্রের ছাইগাদার মধ্যে ওটাকে ঠেসে ধরেন এমন।

উজ্জ্বলা হা হা করে উঠলেন।

'কি বুদ্ধি তোমার! এমন ধোঁয়া আর বিশ্রী গন্ধ হবে যে দু'জন বাড়িতে টিকতে পারব না। ওটা আমার কাছে দাও তুমি।'

সুবোধ বালকের মত ভাদুড়ি আধমরা আরশোলাটাকে স্ত্রীর জিম্মায়

ছেড়ে দেন। হাতের চাপেই ওটার অবস্থা কাহিল তখন। কিন্তু উজ্জ্বলা আর মুহূর্তকাল অপেক্ষা করলেন না। চট্ করে খোঁপা থেকে একটা কাঁটা খুলে নিয়ে তাই দিয়ে আরশোলাকে এফোঁড় ওফোঁড় বিঁধে ফেলেন। বার দুই ছটফট করে ক্যারিয়ার চিরকালের মতো স্থির হয়ে গেল।

'রিয়্যালী এসব কাজে তোমার জুড়ি নেই।' আর উত্তেজনা নেই, খুশিতে দুই চোখ বিস্ফারিত করে ভাদুড়ি সিগারেট ধরান। 'এমন কায়দা করে তুমি সারতে পার।'

উজ্জ্বলা কিছু বলেন না। শান্ত স্থির চোখ মেলে বিজয়িনীর ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসেন।

আমি মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁর হীরকখচিত চম্পক অঙ্গুলির খেলাই দেখছিলাম এতক্ষণ, অন্তত তাঁর তাকানোর বিনিময়ে নীরবে হেসে তাই প্রকাশ করবার চেষ্টা করতে গিয়ে হঠাৎ লক্ষ্য করলাম সিগারেট ধরানো শেষ করে ভাদুড়ি ওধারে, যেন অনেকটা নিজের মনে হাসছেন।

'এমনভাবে হাসছ যে!' উজ্জ্বলা বিরক্ত হয়ে স্বামীর দিকে তাকান। একটু অবাক হন।

'সাহিত্যিক যেভাবে তোমায় দেখছিলেন, মনে হয় এই নিয়ে না তিনি একটা—'

'তাই কি!' অত্যন্ত অপ্রতিভ হয়ে উজ্জ্বলা আমার দিকে চোখ ফেরাতে আমি সবেগে মাথা নেড়ে বললাম, 'না না, ছি ছি! এসব কি গল্প লেখার মালমশলা। আপনি ধৈর্য ধরে থাকুন আমি ভাল গল্প লিখে আনব।' বলে আর অপেক্ষা না করে লম্বা পা ফেলে সেখান থেকে চলে এলাম।

খুকী

বৌবাজার সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড মার্কেট দেখা শেষ করে বসুধা যখন রাস্তায় নামল ঘড়িতে তখন বেলা বারোটা বাজে। চৈত্র মাস। রৌদ্রে চড়চড় করছে পৃথিবী। নীল নিস্পন্দ আকাশের দিকে একবার চেয়ে বসুধা রুমাল দিয়ে কপাল মুছল। গাল ও গলার ভাঁজে পাউডার ও ঘাম একসঙ্গে মিশে কেমন কাদার মতো প্যাচপ্যাচ করছে টের পেয়েও সেসব মুছে ফেলে নতুন করে সে আর পাউডার বুলোতে চেষ্টা করল না। আর তো সে এখন কোথাও যাচ্ছে না। এখন বাড়ি। ঠোঁট দু'টো কেমন শুকিয়ে উঠেছে। তৃষ্ণা অনুভব করল বসুধা। শেয়ালদার মোড় থেকে দু'টো কমলানেবু কিনে নিয়ে এবার সোজা সে গ্যালিফ স্ট্রীটের ট্রামে চেপে বসল।

আজ সে এদিকে এসেছিল খুকীর (বসুধার মেয়ে মণিমালা) জন্যে একটা অর্গ্যান কিনতে। পুরানো, যেমন তেমন একটি হলেও কাজ চলে যায়। মণিমালা শিখবে শুধু। বসুধা দোকানে দোকানে ঘুরে ক্লান্ত। হারমোনিয়ম আছে যদিও কিন্তু হাতফেরতা একটা অর্গ্যানের জন্যে ওরা যত দর হাঁকল বা এমন যে দর হাঁকতে পারে বসুধা ঠিক আন্দাজ করতে পারেনি। তাই সে ঠিক করল কাল যাবে, কি আজ বিকেলেও ও একবার যেতে পারে আমহার্স্ট স্ট্রীটের সেই দোকানটায়। চেষ্টা করলে কি আর এই টাকার মধ্যে সে একটা অর্গ্যান পাবে না। খুব পাবে। খুকীর একটা না হলে চলছে না।

এসব ভাবল সে ট্রামে বসে। আর ট্রাম থেকে নেমে বাড়ির রাস্তায় ঢুকবার আগে বসুধার আরও দু'তিনটা কাজের কথা মনে পড়ে যায়। অবশ্য সবগুলি কাজই সে সম্পন্ন করে, করবার জন্যেই সেই সকাল ছ'টায় একটু চা খেয়ে বেরিয়ে পড়েছিল ও। কেবল আজ বলে নয়, রোজই এমন বেরোতে হচ্ছে। এমন কেউ নেই যে বসুধার হয়ে বসুধার নিজের এবং খুকীর এতসব কাজ রোজ রোজ করে দেবে। সংসারের কে কা'র দিকে তাকায়। আর কেউ করলেও, বলতে কি, বসুধার তো পছন্দ হয়ই না, মণিমালারও মন ওঠে না। সেদিন কা'কে দিয়ে একটা কোল্ড্ ক্রীম আনিয়েছিল সে। সেই ক্রীম খুকী আজ অবধি ছোঁয়নি, তেমনি পড়ে আছে। বসুধা নিজে আর একটা মানে আর এক রকম ক্রীম এনে দিয়েছে তো মেয়ের মন উঠেছে, মুখে মেখেছে সেই জিনিস। আশ্চর্য।

আশ্চর্য, বসুধা অনেক সময় ভাবে, মা'র পছন্দ, মা'র ভাল লাগা না লাগার সঙ্গে ওর পছন্দ অপছন্দের এত মিল কি করে হল, কেন হল! .যেন দিন দিনই বাড়ছে এটা।

না কি বসুধাও মনে-প্রাণে চাইছিল তাই।

সতেরো বছর ধরে এই ইচ্ছাই লালন করে এসেছে ও! মা'র মতো হোক মেয়ে। মা যা পছন্দ করবে মেয়েও তাই করুক।

ভাবতে বসুধার ভালই লাগল। ডাইং ক্লিনিং-এ ঢুকে নিজের শাড়ি শায়া বাছবার আগে বসুধা দেখে নিলে খুকীর সব ক'টা ঠিক আছে কিনা। তিনটে শাড়ি ব্লাউজ চারখানা রুমাল দু'টো। একটা বেড-কভার। তারপর একসঙ্গে সবগুলো গুনে বিল চুকিয়ে বসুধা বেরিয়ে এল দোকান থেকে।

ঢুকল পাশের মণিহারী দোকানে। একটা চিরুনি। বসুধার নিজের যেটা আছে চায়না সে, মেয়ে সেটা ব্যবহার করুক।

ওর আলাদা একটা থাকা দরকার।

আলাদা সব কিছুই বসুধা করে দিয়েছে খুকীর জন্যে। আলাদা সাবানের বাক্স, তোয়ালে, তেল, আয়না, পর্যন্ত আলাদা একটি বিছানা, ওর টেবিল, ওর বসবার ছোট্ট একটি সোফা।

ঘর! আলাদা একটি ঘরের দরকার খুকীর। সেটা অবশ্য আর এখন সম্ভব না। বাড়ির দুর্মূল্যের বাজারে। তা ছাড়া—

তা ছাড়া, যে ঘরে ওরা আছে মা মেয়ে সেই ঘরের সবটাই কি এখন খুকীর নয়! কে আছে, ও ছাড়া, কে আর আছে বসুধার আপন বলতে! এই ঘরের সর্বত্র বসুধা দেখতে চায় খুকী হাঁটছে খুকী বসে আছে পড়ছে কথা কইছে ঘুমিয়ে আছে চুপচাপ।

খুকীই যদি এ ঘরে না রইল ঘর দিয়ে বসুধা করবে কি! খুকী-ছাড়া ওর ঘর! চিরুনির দাম মিটিয়ে দিয়ে বসুধা আস্তে আস্তে নামল রাস্তায়।

এবং রাস্তা পার হয়ে বাড়ির সদরের কাছে এসে, বসুধা ঠিক যা ভেবে রেখেছিল, দেখল চৌকাঠের ওপারে চেয়ার বিছিয়ে ভবানী উকিল বসে আছেন। চেয়ে আছেন হাঁ করে রাস্তার দিকে। অর্থাৎ বাজার করে বাড়ি ফিরবে বসুধা এখন। এখান দিয়েই সিঁড়িতে ওঠবে! তাই কি! বসুধা ঠোঁট টিপে হাসল অথবা হাসি গোপন করবার জন্যে ঠোঁট টিপল একটু।

'এই যে মিসেস চক্রবর্তী, কদ্দূর!'

দেখা হলেই ভবানী দাস ডাকাডাকি করেন চিৎকার করে। ঘাড় তুলে ডান হাতের কাপড়ের বাণ্ডিল বাঁ হাতে নিয়ে মিসেস চক্রবর্তী মানে বসুধা ভবানীর চৌকাঠের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'নমস্কার।'

'জিজ্ঞেস করছিলাম এই রৌদ্রে কোথায় ঘুরে এলেন ?'

'অনেক জায়গায় আমায় হাঁটাহাঁটি করতে হয়েছে মিঃ দাস।'

'সে তো চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি।' মিঃ দাস বসুধার মুখের ওপর থেকে চোখ নামিয়ে ওর হাতের জিনিসগুলো দেখতে থাকেন।

'মেয়ের জন্যে সওদা করে আনা হয়েছে বুঝি! মেয়ের ধোবাবাড়ির কাপড় ?' বলে ভবানী ভ্রূ কুঞ্চিত করেন।

বসুধা মাথা নাড়ল।

ভবানী দাসও নীরব।

অর্থাৎ ভবানীবাবু বুঝেছেন বসুধাকে কত পরিশ্রম করতে হচ্ছে। বসুধা ভবানীর মনের কথা টের পায়। ভবানী ভাবছেন এই সেদিন জ্বর থেকে উঠেই বসুধা আবার বিস্তর হাঁটাহাঁটি করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। বসুধার জ্বর হয়েছিল। কথাটা শুধু ভবানী দাস কেন, দোতলায় যতগুলি ফ্ল্যাট আছে, এবং নিচে, তার সব ক'টির বাসিন্দাই ভাল করে জানে।

তারা কেবল দেখছে অবাক হয়ে কত পরিশ্রম করতে জানে এই মহিলা। নগেন ডাক্তারের স্ত্রী।

মরবার সময় ডাক্তারবাবু একটি হাজার টাকাও রেখে যায়নি।

একলা হাতে বসুধা মেয়েকে মানুষ করছে।

নুয়ে পড়েনি, ভাঙেনি।

এ বাড়িতে কত পুরুষ আছে একটা সংসার চালাতেই হিমসিম খাচ্ছে।

শিথিলতা দুর্বলতার চিহ্ন দেখবে দূরে থাক, যেন তারা দেখছে দ্বিগুণ উৎসাহ বসুধার। অনেকের চেয়েই পরিপাটী, সুন্দর করে সংসার চালানো তো ঠিকই, বলতে গেলে সাজিয়ে রেখেছে। মেয়েকে লেখাপড়া শেখাচ্ছে, গান শেখাচ্ছে, মেয়ের স্বাস্থ্য দেখছে, দেখছে মেয়ের সকলদিকের সকল-রকমের দীপ্তি স্ফূর্তি। ত্রুটি নেই একচুল।

আর যতো বেশি অবাক হচ্ছে ততো যেন সহানুভূতি বেড়ে যাচ্ছে। এ বাড়ির অনেকের। বসুধা টের পায়। এই যেমন নিচের ভবানীবাবু। ওপরের সতীশবাবু। সাত নম্বর ফ্ল্যাটের তারিণীবাবু। কুশল রায়, হেম লাহা। এঁরা বৃদ্ধ। বিরলকেশ স্খলিতদন্ত। কেউ সরকারী চাকরি থেকে পেন্সন নিয়েছেন, কেউ বা ওকালতি প্র্যাক্‌টিস্ করা ছেড়ে দিয়েছেন। ছেলেরা রোজগার করছে, নাতীরা বড়ো হচ্ছে।

সাদা, চাঁদের ফালির মতো চিলতে কপালের ওপর আর একবার নীল ছোট্ট রুমালখানা বুলিয়ে নিলে বসুধা। ভবানীর মাথার পক্ক-অপক্ক চুলগুলি দেখতে দেখতে ছলাৎ করে একটা কথা ওর মনে পড়ে গেছে। নগেন ডাক্তার বেঁচে থাকলে একদিন এমন হত দেখতে? তাই কি!

কিন্তু বসুধার নিটোল পরিচ্ছন্ন হাসিতে সে কথা ফুটল কই।

সে কথা ওর মনে নেই।

তার মনে ভিড় করে আছে এখনকার কথা, আজকের সমস্যা।

'শরীরটাকে অত অবহেলা করবেন না।' ভবানী দাস গম্ভীর হয়ে বললেন।

'আমার তো আর কেউ নেই।' বসুধা মাটির দিকে চেয়ে উত্তর করল, 'সব দিক একলা আমাকেই দেখতে হচ্ছে।'

'তাই তো দেখছি।' নিরুপায় ভবানী উকিল যেন এর বেশি কিছু বলতে পারলেন না। এর বেশি কেউ বলে না। ভাবল বসুধা, তারপর সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠতে লাগল ওপরে।

দোতলার বারান্দায় হেম লাহা বসে। মস্ত শরীর মার্কিনে মুড়ে নিয়ে চুল কাটছেন নাপিত ডাকিয়ে।

শরীর ঘোরাতে না পারলেও মাথা ঈষৎ কাৎ করে হেমবাবু আড়চোখে দেখেই চিনলেন কে।

'মেয়ের জন্যে মাখনের কৌটো আনলেন বুঝি? হরলিকস্? দ্বারিকের সন্দেশ?'

'ধোবাবাড়ির কাপড়।' অল্প হাসল বসুধা এবং এখানেও তাকে একটু দাঁড়াতে হল।

'অই একই কথা।' গম্ভীর গলার স্বর হেম লাহার। এবং বসুধা যা ভাবছিল, ভেবে তার বুকের ভিতর দুব্‌দুব করছিল, হেমবাবু ঠিক তাই বললেন, 'এতো পরিশ্রম করলে আপনার শরীর টিকবে কেন।'

মসৃণ সুগৌর ঘাড়ের সুসংবদ্ধ শক্ত পেশীগুলি হলদে রং ধরে ঢিলে থলথলে হয়ে গেছে হেমবাবুর। বসুধা লক্ষ্য করল। রিটায়ার্ড মুন্সেফ। এই ফ্ল্যাট বাড়ীতেই জীবন কাটালেন। আরো কতদিন এমন কাটবে বসুধা ঠিক সে কথাই এখন ভাবতে পারত, আশ্চর্য সে ভাবনার ধার দিয়েই ও গেলনা। সেকথা বসুধার মনেই হয়নি।

বরং ক্লান্ত কুণ্ঠিতের হাসি হেসে, আস্তে আস্তে বলল, 'কি করব, আমি যে—'

বসুধা একলা। মাথা নত করে হেমবাবুও যেন তাই ভাবতে থাকেন। আর তার অসহায়তায়, তার অমানুষিক পরিশ্রমে বিচলিত বিক্ষত মন নিয়ে এ বাড়ির আরো ক'জন বুড়ো মানুষ এমনভাবে চুপচাপ বসে আছেন তার হিসাব কষতে কষতে বসুধা এগিয়ে চলল নিজের ঘরের দিকে।

কুশল রায় নিশ্চয়ই বাড়ির ভিতরে এখন মধ্যাহ্ন-ভোজনে রত। তাঁর বসবার ঘর শূন্য দেখে বসুধা আন্দাজ করল। এখানেও ওকে একটু সময় দাঁড়াতে হত বৈকি! 'এতো বেলায়, এমন অবেলায় কোথা থেকে ঘুরে আসা হল?' যেন অপরাধ করেছে বসুধা। 'এই গরমে রোদে কী যাচ্ছেতাই হয়েছে চেহারা, দ্যাখো।' ভদ্রলোক হা হা করে চেয়ার ছেড়ে ছুটে আসতেন ঘরের দরজায়। আর বসুধা দেখত অভিযোগ ও অনুযোগের তিক্ত বিরক্ত সব রেখা ভদ্রলোকের শান্ত প্রসন্ন মুখে জেগে উঠেছে। আর সেই সঙ্গে উৎকণ্ঠা উদ্বেগ অস্বস্তি তাঁর ছানিপড়া চোখ দুটোতে প্রকট ও প্রখর হয়ে আছে।

হ্যাঁ, এমন বিচলিত হয়ে পড়েন এঁরা।

কিন্তু কুশল রায় সেখানেই থামতেন কি।

'মেয়ে বড়ো হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে, একটা পাশ পর্যন্ত করল। এবার ভাল একটা ছেলে দেখে বিয়ে দিন, মিসেস চক্রবর্তী, আর কত!'

অর্থাৎ নিচের ভবানীবাবু যেমন একটা ইঙ্গিত করেই ক্ষান্ত হন,

হেম মুন্সেফ সরাসরি বলে ফেলেন, সোজা রাস্তা দেখিয়ে দেন। 'আর কত,—মেয়ের জন্যে আর কত করবেন, মিসেস চক্রবর্তী।'

এবং এই কথার উত্তরে বসুধার বলার কিছু থাকে কি! নির্মল হেসে কৃতজ্ঞ চোখে প্রবীণ সবজজের উদ্বিগ্ন রেখাঙ্কিত মুখের দিকে তাকিয়ে বসুধা তাঁর উপদেশটা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করে বটে, অন্ততঃ মুখের ভাবে তখনকার জন্যে তাই ওকে করতে হয়। তারপর আস্তে আস্তে সরে যায়।

ভাবতে ভাবতে বসুধা কুশল সবজজের ফ্ল্যাটও পার হয়। এঁরা দেখছেন বসুধাকে। বসুধা দেখছে মেয়েকে। একি সত্যি অদ্ভুত নয়! না কি ডাক্তার বেঁচে থাকলে এই-ই করত! বসুধা রৌদ্রে গরমে ঘুরে এলে এমন ব্যস্ত ব্যাকুল হয়ে ছটফট আরম্ভ করে দিত!

এঁরা কি বোঝেন না বসুধার এতো ছুটোছুটি, দিনরাত এই পরিশ্রম, শরীর না সারতে শরীরের ওপর এমন ধকল বিনা কারণে নয়! নিজের শরীর ক্ষয় করে নিজেকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে সে যে আর একটি শরীর গড়ছে,—একদিকের খরচ দিয়ে অন্যদিকের সঞ্চয়। আর—

বারান্দার বাঁক ঘুরতে তারিণী নন্দীর ঘরের দরজা। বসুধার চিন্তায় ছেদ পড়ল। তারিণীবাবুকে দেখলে খুশি হ'ত এবং হেমবাবু বা কুশল রায়ের সঙ্গে যেভাবে সে কথা বলে এসেছে, যেভাবে উত্তর দিয়েছে তাঁদের স্নেহ ও সহানুভূতির সঙ্গতি রেখে অল্প একটু হেসে, একটু লজ্জিত হয়ে,—বসুধা এখানেও ঠিক সেভাবেই দু'টি কথা শোনা ও দু'টি কথা বলার জন্যে মনে মনে তৈরী হচ্ছিল। তারিণী নেই। স্বয়ং তারিণী-গিন্নী দাঁড়িয়ে

আছে চৌকাঠ ধরে। যেন বৈঠকখানা ঝাড়পোছ করছে, কোমরে আঁচল জড়ানো, স্ফীত বিশাল দেহ বেয়ে ঘামের স্রোত বইছে অনর্গল।

বসুধা চোখ ফিরিয়ে নিলে। তারিণী-গিন্নী কদর্যরকম মোটা হয়ে গেছে বা কুৎসিৎ ভাবে ঘেমে উঠেছে বলে নয়, ভদ্রমহিলা এমন সাংঘাতিক কটমট করে তাকায়, বসুধা যখন এই বারান্দা পার হয়ে তেতলার সিঁড়িতে ওঠে বা নীচে নামে, যার কোন অর্থ হয়না। কি কারণ।

অথচ,—না, কেবল এই মহিলাটির কথা নয়, ব্যাপকভাবে এ-বাড়ির প্রায় সব ক'জন মহিলার কথাই বসুধার মনে হয় এই সঙ্গে। কাল বিকেলে দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে হেমবাবুর স্ত্রী বসুধার সঙ্গে চোখাচোখি হতে এমনভাবে ঠোঁট বেঁকিয়ে ভুরু কোঁচকালো কেন। হ্যাঁ, এই কুশল রায়, যিনি বসুধাকে দেখলে উত্তাল ও অস্থির হয়ে পড়েন তাঁর ঘরের মানুষটিরও সেই রোগ আছে। বসুধা যেন ভূতের ছায়া। সেদিন ও যখন কুশল রায়ের দরজার সামনে দিয়ে যাচ্ছিল তখন রায়গিন্নী দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে। একি ছেলেমানুষী নয়! বসুধা মনে মনে হেসেছে। এর কী অর্থ থাকতে পারে! বসুধা তোমাদের সাতেও নেই পাঁচেও নেই। সত্যি বলতে কি, এদের পুরুষরা যেচে, বলতে গেলে গায়ে পড়ে ওর সঙ্গে কথা বলে, তাই বসুধাও একটা দু'টো কথা কয়। একসঙ্গে একবাড়িতে থেকে আজ অবধি, বসুধা কারো ঘরেই যায়নি। দরকার কি। সে আছে তার নিজের ভাবে। তাই, এদের,—এই গিন্নীদের এক এক সময় বসুধার ডেকে বলতে ইচ্ছে হয় ভদ্রতা গায়ে লেখা থাকে না, তোমরা যদি অভদ্র হও অসুন্দর হও তাতে বসুধার কিছু যায় আসে না।

না কি বসুধার মেয়ে এ-বাড়ির আর পাঁচটি মেয়ের চেয়ে সুন্দর এই ঈর্ষা! খুকীর মতো গায়ের রং, নাক, চোখ কেউ পায়নি আর সতেরো বছর বয়সে কেউ পাশও দিতে পারেনি তাই এবাড়ির আর সব মেয়ের মায়েদের মন খারাপ? মেয়েদের মন! বাঁ হাত থেকে কাপড়ের বাণ্ডিলটা ডান হাতে নিয়ে বসুধা আস্তে আস্তে তারিণীবাবুর বৈঠকখানাও পার হ'ল।

খুকীর মতো এমন গলা নেই কোনো মেয়ের। গান শেখার ধুম তো শোনা যাচ্ছে ঘরে ঘরে। ভাবল বসুধা।

কী আছে খুকীর সঙ্গে তুলনা করলে এ-বাড়ির ডলি মিলি লোটন বাসন্তী হেনা সুধার? না তিনতলার চকোর চামেলীর?

যে-শাড়ি পরবে সেই শাড়িই মানায় খুকীকে। খুকীর মতো বেণী হয়না কারো। চুলই বা আছে কোন্ মেয়ের মাথায় কত। বেণী বাঁধবে! ভেবে বসুধা নিজের মনে হাসল।

সত্যি, এ-বাড়ির সব মেয়েকেই বসুধার চোখে এমন কুৎসিৎ ঠেকে। মায়েরা যদি জানতো বসুধার মনের কথা!

না কি বসুধা স্বতন্ত্র ও স্বাধীন থেকে ডাক্তারের মৃত্যুর পরও নিজে রোজগার করে ছিমছাম ছোট্ট ওর সংসারটি চালাচ্ছে, অভাব নেই হায়-হুতাশ নেই এবাজারেও—তাই সকলের ক্ষোভ!

কিভাবে সংসার চালাচ্ছে কী করছে বসুধা সকলের মনে এই প্রশ্ন? সন্দেহ? কেমন চাকরি তার কৌতূহল! মেয়েমানুষ চাকরি করে!

নিশ্চয়ই, বসুধা সকলের চেয়ে ভাল খায়। ডাক্তার থাকতে যদি একতলায় ছিল ওরা, এখন মা মেয়ে উঠে গেছে তেতলার সবচেয়ে ভাল

ফ্ল্যাটে। রেডিও এনেছে, পাখা খাটিয়েছে ঘরে। ঘরে সে ফুল রাখে, ফার্নিচার করছে কিছু কিছু।

জজ মুন্সেফ, এবাড়ির উকিল অধ্যাপকরাও যা পারছে না।

তাঁদের স্ত্রীদের কাছে বসুধা একটা খট্‌কা বৈকি! অনিয়ম। অবাঞ্ছিত।

বসুধা বড় একটা গ্রাহ্য করে কিনা ওদের চাওয়া আর না চাওয়া! তিনতলার সব ক'টা সিঁড়ি শেষ করে ওপরের রৌদ্র ফুরফুরে খোলা পরিচ্ছন্ন বারান্দায় উঠে এল ও। মনে মনে বলল, বাঁচলাম। আর একটা কথা মনে করে বসুধা শূন্যের দিকে চেয়ে মৃদু হাসল। যদি এই তোমাদের মনের ভাব, তোমরা গিন্নীদের, কর্তাদেরও কেন নিষেধ করে দাওনা বসুধার সঙ্গে কথা কওয়া দিন কতক বন্ধ রাখুক। বসুধার দুঃখ নেই তাতে।

বসুধা দুঃখ পাবে যদি হেমবাবু তাকে দেখেই চুপ করে থাকেন?

বুড়ো ভবানী দাস যদি আর না তাকান?

কুশল রায় বসুধার স্বাস্থ্য নিয়ে এতটা শঙ্কিত না হন? সাদা স্বল্প-চুলযুক্ত কয়েকটি মাথা আর কুটিল ঈর্ষান্বিত মেদবহুল কতগুলি মুখ বসুধার চোখের সামনে ভেসে উঠল। কোনোপক্ষে নেই, বসুধা মনে মনে বলল, সিঁড়িগুলি দিয়ে যখন সে ওঠা নামা করে তখন, তখনই শুধু একপক্ষের সহানুভূতি দেখে সুন্দর করে হাসে ও, সরল স্বাভাবিক নিয়মে সংসারাসক্ত প্রবীণদের সমবেদনার মূল্য দেয় সংক্ষেপে একটি দু'টি কথা বলে—যা উচিত, শোভন, আর এতেই যদি এঁরা সন্তুষ্ট থাকেন। বাইরে গেলে বা যতক্ষণ নিজের ঘরে থাকে সবগুলি মুখ কি সে ভুলে থাকে না! তেমনি এবাড়ির প্রবীণাদের ঈর্ষায় কণ্টকিত সন্দেহে শীর্ণ চাউনি কতক্ষণ মনে থাকে বসুধার। কতক্ষণ

মনে রাখে ও। কী তার মূল্য! পরিচ্ছন্ন প্রশস্ত বারান্দা পার হয়ে নিজের দক্ষিণ-খোলা ঘরের কাছে এসে ঘরের দরজা জানালায় নিজের হাতে খাটানো নীল নতুন পর্দাগুলোর দিকে তাকাতে তাকাতে এসব কি ও এখনি ভুলে গেল না! বসুধা আবার হাসল। দেখতে দেখতে ওর খুকী কত বড় হয়ে গেছে!

খুকী বাড়ছে খুব তাড়াতাড়ি, হঠাৎ মনে হল বসুধার। গতবছরের সোয়েটার এবার শীতে মেয়ে গায়ে দিতে পারল না। এবং নতুন একটা কিনতে হয়েছে। এসব বিষয়ে বসুধার কার্পণ্য নেই। যখন যা দরকার,—নিজে গিয়ে দেখে কিনে আনছে। কিন্তু একটা জিনিস সে আজও কোনো দোকানে খুঁজে পেলে না। বসুধা যে-ঘাসের চটিটা পরছে খুকী চেয়েছিল ঠিক সেরকম চটি। ওর খুব পছন্দ ওরকম চটি। মাঝখানে একটি করে ঘাসফুল।

আশ্চর্য, মার যা ভাল লাগে মেয়ের ঠিক তা-ই কেন ভাল লেগে যায়। সব মেয়েরই কি এমন হয়!

দরজার পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বসুধা এ-বাড়ির সব মেয়ের মুখ আর মণিমালার মুখ একসঙ্গে তুলনা করল।

বসুধার দুই ভুরুর মাঝখানে গোপন মৃদু জিজ্ঞাসা। মধুর উষ্ণ পরিতৃপ্তি ছড়িয়ে পড়ে সারা মনে।

কেন এমন হয়, কেন এমন হল মণিমালা।

ঘরে ঢুকে হাত থেকে খুকীর কাপড়গুলো নামিয়ে ও রাখল খুকীর টেবিলের পাশে। নতুন চিরুনিটা রাখল খুকীর আয়নার সামনে। মেয়ে

ঘরে নেই। বাথরুমে গেছে। জলের ছপ্ ছপ্ শব্দ শুনে বসুধা তাই আন্দাজ করল।

তাই খুকীর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বসুধা চট্ করে সরে এল না। এমন এক একটি সময় আসে। খুকী যখন ঘরে থাকে না। খুকীর খাটের ওপর ঝুঁকে পড়ে বেড-কভারের পদ্মকলিগুলো দেখতে দেখতে, ওর টেবিলের বইগুলো নাড়তে নাড়তে, ওর নতুন কেনা সুন্দর ফ্রেমে-আঁটা বড় আয়নাটির দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত এক অনুভূতিতে বসুধা আচ্ছন্ন হয়।

আর ভাবে। শুধু তার বেলায়ই কি এমন হয়! আরো যারা মা আছে আর মেয়েরা যাদের বড় হচ্ছে? বসুধা প্রশ্ন করে নিজেকে।

মার বয়স সাইত্রিশ, মেয়ে সতেরোয় পা দিয়েছে এখন?

না কি এমন মা নেই এ-বাড়িতে, আর এ বয়সের মেয়ে! যৌবনের ম্রিয়মাণ মধ্যাহ্নশেষের রৌদ্রে দাঁড়িয়ে কাউকে দেখতে হচ্ছে না, দেখতে পাচ্ছে না নতুন ঝক্‌ঝকে একটি শরীর ভরে লাবণ্যের ঝিকিমিকি জ্যোৎস্না-রেখা!

খুকীর আয়নায় নিজের মুখ দেখতে দেখতে বসুধা একটা রুদ্ধ নিঃশ্বাস ফেলল। আড় চোখে একবার চেয়ে দেখল সকালের সবটুকু দুধ ও রুটি-মাখন মেয়ে খেয়েছিল কিনা! কোনো কোনো দিন খেতে চায়না, অর্ধেকই পড়ে থাকে, কতদিন এসে সে দেখেছে এই টেবিলে। বসুধা এটা পছন্দ করে না। এবং দরকার হলে এর জন্যে খুকীকে কটুকথা অনেকদিন শোনাতে হয় বৈকি।

আর, অসাবধান মেয়ে ঘুমের সময়। মশারী খাটানো আছে তবু ধারগুলো একটু হাত বাড়িয়ে টেনে দেবে না। কত যেন কষ্ট।

এ-বাড়ির ভুবনদাসের একটি ছেলে, দোতলার একটি শিশু ম্যালেরিয়ায় ভুগছে মণিমালা একথা জানে না কি ? বসুধা কতদিন নিজের খাট থেকে উঠে এসে মেয়ের মশারী টেনে দিয়েছে মাঝরাত্রে।

ভুল ? আলস্য ? ঘুমন্ত মেয়েকে হঠাৎ বকতে গিয়ে বসুধা কি ভেবে সেদিন চুপ করেছে। তারপর নিজের খাটে ফিরে এসে শুয়ে শুয়ে চিন্তা করেছে।

না কি সকালের দুধ খাওয়ার মতো মশারী খাটানো ওর ভাল লাগে না!

বসুধা এখন আবার ভাবল নতুন করে।

সত্যি, ঘুম আর খাওয়ার ব্যাপারে মেয়ের ঔদাসীন্য, ভাল-না-লাগার লক্ষণগুলো দিন দিন যেন বাড়ছে।

মন খারাপ হয় বসুধার, আবার এক এক সময় ভালও লাগে দেখতে। আ,—এ বয়সের ভাল-লাগা না-লাগা।

ঘাড় ফিরিয়ে খুকীর দুধের গ্লাস থেকে চোখ সরিয়ে বসুধা তাকাল এবার দেয়ালের দিকে। খুকীর টুথ-ব্রাসটা হুকে ঝুলছে।

নিশ্চয়ই আজ আবার ভুলে গেছে খুকী। সকালেও দাঁত মাজা হয়নি। বসুধা দেখে গেছে। বিছানায় বসে মেয়ে চা খাচ্ছিল তখন।

বসুধা দেখল মণিমালার চুলের রীবনগুলো একটাও জায়গায় নেই। অর্থাৎ বাথরুমে যাবার আগে যেখানে সেগুলো ও ঝুলিয়ে রাখে। তার অর্থ মেয়ে আজও চুল খোলে নি, মাথায় জল দেবে না। কাল মেঘলা দিন ছিল

বটে, কিন্তু আজ তো রৌদ্রে দেশ পুড়ে যাচ্ছে। আজ চুল না ভেজাবার কারণ কি। অনিয়ম। জানালার দিকে তাকাল বসুধা। এই একটু আধটু অনিয়ম,—মেয়ের স্বভাবের একটু একটু পরিবর্তন বসুধা ক'দিন ধরে দেখছে। দেখছে আর ভাবছে।

না কি এই হয়। এরকম হয়েছিল বসুধার এবয়সে! ঘাড় ঘুরিয়ে খুকীর আয়নায় ফের সে নিজের মুখ দেখল। সত্যি খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে চেহারা। স্টোভ ধরিয়ে একটু চা করে খাবে কিনা বা একটু ওবলটিন, ভাবতে পারত ও, তাই ভাবা উচিত ছিল, সারা সকাল এত ঘোরাঘুরি করে ঘরে ফিরে এসে এসময়ে। 'এত পরিশ্রমে শরীর টিকবে কেন'—এই মাত্র কে বলেছিল, হেমবাবু কি কুশলবাবু, না নিচের ভবানী দাস। আশ্চর্য, তা-ও আর বসুধার এখন মনে নেই। নিজের সম্পর্কে এত বেশি ভুলে থাকে ও ঘরে পা দিতে না দিতে। তাই বলা চলে, বসুধার সব চিন্তা সবটুকু মনোযোগ, সকল ভাবনা আর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা কি কেবল মেয়েকেই কেন্দ্র করে নয়? খুকী, খুকী। কিন্তু খুকীর জুতো কোথায়! জুতো রাখার শেল্‌ফ-এর দিকে হঠাৎ চোখ পড়তে বসুধা অবাক হল।

না, বুটিদার খয়েরীরঙের ব্লাউজটাও যে ঝুলছে না ব্রেকেটে। হ্যাঁ, নতুন কেনা শাড়িখানাও নেই আলনায়।

আশ্চর্য, এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ভাবছিল সে মণিমালা বুঝি বাথরুমে গেছে। জল পড়ছে ওমনি। উড়ে ভূতটা কি কাজ সেরে কোনোদিন কল বন্ধ করে গেছে! বসুধা ত্যক্ত হয়ে গেছে চাকরটাকে নিয়ে।

কিন্তু, চিন্তিত হল ও ভেবে, এমন অসময়ে কোথায় বেরোতে পারে খুকী। অবশ্য মেয়ের বেরোনো নিয়ে বসুধা বাড়াবাড়ি করেনি কোনোদিন। মেয়ে লেখাপড়া শিখেছে বড়ো হয়েছে বুদ্ধি রাখে। বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন ও পরিমিতিজ্ঞান এ বাড়ির অনেকের মেয়ের চেয়ে বেশি আছে ওর, মা হয়ে বসুধা জানে। সে বিষয়ে সে নিশ্চিন্ত।

বলতে কি বসুধা অনেকদিন বলে কয়ে মেয়েকে পাঠিয়েছে, একটু খোলা হাওয়ায়। পরীক্ষার আগে সারাদিন যখন বইয়ের ওপর ঝুঁকে থাকত। 'একটু বাইরে ঘুরে আয়গে,' বলেছে বসুধা।

'এখানে তো বেশ হাওয়া আছে মা, আমাদের এই খোলা বারান্দায়।' খুকী হেসে উত্তর দিয়েছে।

তবু মেয়েকে জোর করে পাঠিয়েছে বসুধা, একটুক্ষণ বেড়িয়ে আসতে। 'স্বাস্থ্য দেখতে হবে আগে।' বলেছে বার বার। বুঝিয়েছে।

এগ্‌জামিন হয়ে গেছে পরেই বা কি। 'মা তুমি যদি বাইরে যাও আমার একটা রাইটিং প্যাড কিনে এনো, আমার অমুকটা ফুরিয়েছে।'

মা'র ওপর নিভর। বাইরে ও বড় একটা যায় কোথায়!

কিন্তু—

বসুধা ওর ছাতা-ব্যাগ কিছুই আজ ঘরে দেখতে না পেয়ে পরিষ্কার বুঝল, খুব ধারে কাছে যায়নি, তা'লে এমনি বেরোতো। গেছে দূরে। সত্যি এত জামাকাপড় থাকতে, এমন সুন্দর তিনজোড়া জুতো থাকতে সাদাসিধে একখানা কাপড় আর স্যাণ্ডেল পরেই খুকী স্বভাবত দরকার হলে বাইরে যায়। তা-ও খুব কাছে।

আজ সে-নিয়মের ব্যতিক্রম দেখতে পেলে বসুধা। শাড়ি আর রঙিন ব্লাউজ মেয়ের গায়ে উঠেছে।

উঁচু হিল্-এর জুতোটা এতদিন পর পায়ে লাগল তবু। ছাতা নিয়েছে সঙ্গে। বসুধা খুশী হল।

বসুধা এই প্রথম, জানালার বাইরে চৈত্রের নতুন পাতাভরা দেবদারু গাছের মাথার দিকে তাকিয়ে কল্পনায় দেখল দূরের একটা রাস্তার পাশ ধরে হেঁটে হেঁটে চলেছে মণিমালা, না কি হাতল ধরে ট্রাম থেকে নামছে। দোকানে ঢুকবে! সহপাঠিনী কোনো বন্ধুর বাড়ির রাস্তা ধরল?

বাইরের আকাশে চোখ রেখে বসুধা হাসল একটু।

যেন খুকী হাঁটতে হাঁটতে একবার দাঁড়াল, তা-ও এখান থেকে দেখতে পাচ্ছে বসুধা, কপালে ঘামের ফুট্‌কি! নীল ছোট রুমাল ব্যাগ থেকে বার করে বার বার মেয়ে ঘাম মুছচে।

আস্তে আস্তে, খুকীর কথা ভাবতে ভাবতে, বসুধা ঘর ছেড়ে ফের এল বারান্দায়। তার কাপড় ছাড়া হয়নি, খোলা হয়নি জুতো।

চৈত্রের স্তব্ধ দুপুর প্রচুর রৌদ্র ও আলস্য ছড়িয়ে আকাশের গায়ে ঝুলছে, বসুধা চোখ মেলে তাই দেখতে দেখতে যেন ছবি আঁকল দূরের।

কতদূর গেছে খুকী এবং কোন্ রাস্তায়!

এখন, এ সময়ে, বসুধার যতখানি অভিজ্ঞতা, রাস্তায় লোকজন কম চলে, গাড়ীঘোড়া বিরল।

গরম অ্যাশফল্‌ট পায়ের তলায় চটচট করে যদি তুমি রাস্তার ওপারে যেতে চাও। তপ্ত হাওয়ার নিঃশ্বাস চারদিকে।

মণিমালা একটি রাস্তা পার হল, বসুধা কল্পনায় দেখল। দেখল চাঁপা রঙের নিটোল মসৃণ হাত, চাঁদের ফালির মতো ছোট্ট কপাল আর আপেলের মতো গোল, একটু বা চাপা, কোমল সুন্দর চিবুক লাল হয়ে গেছে গরমে, তবু খুকী হাঁটছে।

আজ আর, কেন জানি বসুধার মনে হল, চেরা-বেণী নয়, সুন্দর শোভন খোঁপা উঠেছে খুকীর মাথায়। তাই, কি মনে হতে তাড়াতাড়ি বসুধা আবার ঘরে এল। দেখল কাজলদানীতে নতুন কাজল করা হয়েছিল। কুমারী চোখে আজ তা'লে এই প্রথম কাজল পরেছে মেয়ে।

সত্যি, বসুধার বুকের ভিতর ঢুব্ ঢুব করছে অসহ্য সুখে। আলমারী খুলে দেখলে, যা সে ভেবেছে, গয়নার বাক্সে দুল জোড়া নেই। রিং ছেড়ে রেখে ওটা পরে গেছে খুকী।

আর কি নেই, আরো কি নিতে পারে খুকী সঙ্গে, বসুধা ঘরের চার-দিকে তাকিয়ে তাই খুঁজল যেন। স্নান খাওয়ার কথা বসুধার একবারও এখন মনে হলনা, খাওয়ার পরে বিশ্রাম বা দুপুরের নিয়মিত নিদ্রা। এতদিন, এতকাল বসুধাই নানা জায়গায় ঘুরে ফিরে অবেলায় ঘরে ফিরেছে। মা'র আসতে দেরী দেখে খুকী খাওয়া শেষ করেছে। 'আমার ফিরতে কত বেলা হয় তার ঠিক কি—তুমি বসে থেকো না।' বসুধা মেয়েকে বলে রেখেছে 'অনিয়ম ভাল নয়, স্নান খাওয়া সেরে ফেলো।'

না কি আজ সেই নিয়ম-রক্ষা বসুধা করবে! মেয়ে যখন বাইরে গেল! স্নান সেরে এখনি খেতে বসবে! তারপর ঘুম।

বসুধার বুকের ভিতর মোচড় দিয়ে উঠল। নিয়ম। যদি তা-ই হত

তবে এই সেদিন অসুখ থেকে উঠে আবার এত হাঁটাহাঁটি ও পরিশ্রম তোমার মা করত না। রোজ সকালে গ্লাস ভরে তোমাকে দুধটুক না খাইয়ে বসুধা নিজের জন্যে রাখত। তুমি মেয়ে আমি মা,—বসুধা প্রায় বিড়বিড় করে উঠল। তোমার স্বাস্থ্য ও সুখ আগে, পরে আমার। আমার ওটা গৌণ, তোমারটাই মুখ্য। তুমি আমার লক্ষ্য, তুমি স্বপ্ন।

দেয়াল থেকে দেয়ালে বসুধা চোখ ফেরাল, ভাবল। নগেন ডাক্তার অসময়ে মারা গেছে, আত্মীয়বন্ধু অন্তর্হিত। কপর্দকহীন বিধবা, তার ওপর একটি অপোগণ্ড। হ্যাঁ, শেষ হয়ে যাওয়াই তো উচিত ছিল, সেই দশবছর আগে। নিয়মরক্ষা হত সেটা। জীবনধারণের দুঃসহ চাপে মধ্যবিত্ত এই নিঃস্ব মহিলা, তা না হয়ে, দিব্যি দাঁড়িয়ে আছে, বেঁচে আছে। অভাবিত, যা কেউ ভাবতে পারছে না। চোখ-টাটানো ব্যাপার।

অর্থাৎ বসুধার বেঁচে থাকতে পারাটাই অপরাধ, অনিয়মের সামিল। তার ওপর চাকরি করছে, মানুষ করছে মেয়েকে মনের মতন।

তাই কি এ বাড়ির সিঁড়ির আনাচে কানাচে নিন্দা ঈর্ষা সন্দেহ! যেন আর সব মায়েরা ভাবতেই পারে না, এ অবস্থা ওদের হলে, ছেলে বা মেয়ের জন্যে কতটুকু ওরা করতে পারত।

ওরা অবাক, ওরা নিষ্ঠুর।

এবং এসব নিন্দার, নিষ্ঠুরতার, অপবাদের জঞ্জাল দুই হাতে ঠেলে ঠেলে বসুধাও এগিয়ে গেছে, থামেনি। কাকে ভয়? কিন্তু কেন, কা'র জন্যে, কোন্ মুখটির দিকে চেয়ে সে এতো করছে।

অথচ, বলতে কি খুকী এসব বোঝে না, আজও ও কত শিশু! দুই

চোখ বুজে খুকীর মুখখানা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মনে মনে একবার বিশ্লেষণ করে বসুধা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলল। না, এটা ওর ভাল লাগে, বসুধা চেয়ে এসেছে তা-ই। বয়সের অনুপাতে, কেবল চেহারা নয়, মেয়েদের মনও যদি পেকে যায় আগে আগে সেকি সত্যি খুব দুঃখের নয়! এ-বাড়িতে এ-বয়সের আরো কত মেয়ে তো আছে। সব ক'টাকেই মণিমালার চেয়ে সেয়ানা, বেশি বুড়ি মনে হয়। বসুধার চোখে তো তা-ই ঠেকে।

অবশ্য আজ এই দুপুর রোদে ছাতা-ব্যাগ হাতে দূরের একটি রাস্তা ধরে খুকী চলেছে ভাবতে বসুধার যেমন ভাল লাগছিল তেমন একটু কষ্টও পাচ্ছে সে মনে মনে।

ভাত খেয়ে বেরোয়নি। অনভ্যস্ত দ্বিধাগ্রস্ত দু'টি পা। রাস্তাঘাট সম্পর্কে ধারণাই বা কতখানি। আর, ট্রাম-বাস না থাক সব জায়গায়, গরম পিচ্ ছাড়াও যে পথের ডাইনে বা বাঁয়ে কোন কোন দিকে ছায়া-ঢাকা সুন্দর পেভ্‌মেণ্ট থাকে তা কি খেয়াল থাকবে মেয়ের। বসুধার হঠাৎ আবার খুকীর মশারী না খাটিয়ে শুয়ে পড়ার ছবিটা মনে পড়ল।

না, এখন বসুধার মনে হচ্ছে, এর সবটাই মেয়ের ভুলে থাকা বা খেয়াল না রাখা নয়। এর পিছনে যেন একটুখানি ইচ্ছাও লুকিয়ে আছে। এই কষ্ট পাওয়ার, শরীরকে একটু পীড়ন করার।

বসুধা মনে মনে হাসল।

মা সকালে শুধু চা খেয়ে বেরোয়, আমারও তাই দুধরুটি রুচবে না, মা মশারী টাঙায় না, আমার কেন। মা রোজ রৌদ্রে বেরোয়, আমিও যাব। খাব এসে অবেলায়।

অর্থাৎ আমিও এখন থেকে একটু একটু কষ্ট করব। এই ?

ওর অনেক সময় চুপচাপ জানালার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা, খেতে বসে হঠাৎ খাওয়া বন্ধ করে ভাবা, চোখে চোখ পড়তে চোখ সরিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে সরে পড়ার টুকরো টুকরো সব ছবি বসুধার চোখের সামনে ভেসে উঠল। কদিন ধরেই খুকীর এই পরিবর্তন লক্ষ্য করছে সে। ওর শরীরের আশ্চর্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনের পরিবর্তন। বসুধা ভাবে। যেন সতের বছরের একটি ধানশীষ। ওপরের রং পাকা সোনার মতো হচ্ছে শক্ত হচ্ছে মনের দুধ। খুকী বড় হচ্ছে। খুকীর আয়নায় নিজের মুখ দেখতে দেখতে, বসুধা নতুন করে বরং খুকীকেই দেখল।

কিন্তু না, ভাবছিল সে, আগে থাকতে বসুধা যদি জানতো দুপুরে আজ মণিমালা বেড়াতে বেরোবে সেভাবে সে ব্যবস্থা করত। একটা ডিম সিদ্ধ করে দেওয়া যেতো ওর সকালের মাখনরুটির সঙ্গে। আর পুরোনো সেই ফ্লাস্ক্‌টায় করে একটুখানি চা। দিতে পারতো ওকে রিস্টওয়াচটা, আজ ছুটির দিন ডিউটি নেই, দরকার ছিল না বসুধার হাতঘড়ির। আরো কি দিতে পারতো মেয়েকে ভাবতে ভাবতে বসুধা মণিমালার শূন্য খাট, টেবিল চেয়ার আলনার দিকে তাকিয়ে ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

হাতঘড়ির দিকে চোখ পড়তে দেখল একটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ। আড়াইটার কাছাকাছি কাঁটা। ঘরের ভিতরটা কেমন একলা ঠেকছিল, হাঁফ ধরছিল তার। আস্তে আস্তে আবার এসে দাঁড়ালো বারান্দায়।

না, এই প্রথম আজ, ভাবল বসুধা, মণিমালা এমন সময়ে বাইরে, আর বসুধা আছে ঘরে বসে। এমন আর কোনোদিন হয়নি। বারান্দায় এসে

বসুধার একটু ভাল লাগল। চৈত্রের হাল্কা হাওয়ায় ওর জানালার পর্দাগুলো রবারের এক একটি বেলুন হয়ে সুন্দরভাবে ফুলে ফুলে উঠছে। এ-বাড়ির আর সব ঘরে জানালা আছে বৈকি, পর্দা নেই। লজ্জা ঢাকবার জন্যে ওরা বরং সদরের দিকের জানালাগুলোই বন্ধ করে রাখে রাতদিন। সংস্কার।

বসুধা হাসল।

কোথায় থাকে এই লজ্জা গিন্নীরা যখন খালি খোলা গায়ে সদরের চৌকাঠ ধরে দাঁড়ায়। একটা সেমিজ পর্যন্ত না।

দোষ বসুধার। বসুধা বাইরে যায়। এরা ডিপুটি-গিন্নী উকিল-গিন্নী মুন্সেফ-গিন্নী।

অথচ এঁদের মেয়েরাও বাইরে যাচ্ছে কলেজ করছে। কিন্তু না, যেহেতু মাথার ওপর ওদের বাপ আছে স্বামীর ছায়া আছে তাই ওরা সব ভাল সবাই সুস্থির। বসুধা একলা, মণিমালার বাপ নেই? বসুধা একলাই পুরুষের হাল ধরেছে আর মণিমালা সেই হালের ছায়ায় মানুষ হয়েছে সুতরাং দূরে থাক?

দূরেই সরিয়ে রেখেছে বসুধা খুকীকে। নিজে সে যেমন এ-বাড়ির কোনো মেয়ের সঙ্গে মেশে না তেমনি খুকীকেও কারোর সঙ্গে মিশতে দেয়না। বলতে কি এ-বাড়ির লোটন চাঁপা বাসন্তীকে বসুধা অনেকদিন রাস্তায় পার্কে, চায়ের দোকানে ছেলেদের সঙ্গে বসে দিব্যি আড্ডা দিতে দেখেছে। বসুধা বাইরে যায় বলেই বাইরের এতসব জিনিস তার চোখে পড়ে।

আজ খুকী যখন সেজেগুজে বাইরে গেল, বসুধা কল্পনায় আনবার চেষ্টা করল, না জানি কেমন হয়েছিল গিন্নীদের চেহারা আর ওদের মেয়েদের।

আর সেই সঙ্গে বসুধার চোখের ওপর আরো কয়েকটি মুখ ভেসে উঠল। বালাপোষ গায়ে দিয়ে যাঁরা বৈঠকখানায় বসে থাকেন। যাঁরা উঠতে নামতে মেয়ের মাকে তাগিদ দিচ্ছেন, আর কত, এইবার বিয়ে দিন মেয়ের। অনেক তো করলেন। যেন তাঁরা ঠিক মালুম করতে পারছেন না বসুধার বা এখন বয়স ঠিক কত। খুকী সব গোলমাল করে দিচ্ছে! অনেক বড় হয়ে গেল!

বসুধার হাসি পায় পুরুষদের বয়সভ্রম দেখে। যেন একটি ছোট ফুল বড় ফুলের পাশে ফুটতে ফুল দু'টোর আকৃতি ও অবয়বের মতো রং ও গন্ধেরও গোলমাল হচ্ছে। তাই কি সরিয়ে দেখতে চাইছেন এঁরা মেয়ে ছাড়া মা কেমন, মা বাদ দিয়ে মেয়ে কিরকম দেখতে! অথচ এক একজনের মেয়ের বয়স ঢের বেশি হয়েছে খুকীর চেয়ে। লক্ষ্য সেদিকে নয়।

সেই মুখগুলির কিরকম ভাবান্তর হয় খুকী যখন সুন্দর সাজগোজ করে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামে বসুধার দেখতে ভারি ইচ্ছা হয়। কথাটা মাঝে মাঝে সে ভাবে বৈকি।

এখনও ভাবল। তার জানালায় পর্দা, আর দোতলার নিচের সবগুলো ফ্ল্যাটের রেলিং-এ বারান্দায় ঝুলছে অসংখ্য কাঁথা ও অয়েলক্লথের টুকরো। বসুধা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল ভবানী দাসের পঞ্চাশোত্তর জীবনের কীর্তিস্বরূপ তাঁর আধুনিকতম একটি নাবালকের ফ্রক পেনি শুকোতে দিচ্ছে ভবানী-গিন্নী। স্ফীতোদর হেম লাহার পুত্রবধূর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হেমজায়া এই একাদশবার সন্তান সম্ভাবনায় রোদে বসে পাণ্ডুর হাতে পায়ে অলিভ তেল মালিশ করছে অবিশ্রাম। কুশল-গিন্নী বৈঠকখানা ঝাড়পোছ শেষ

করে এবার বুঝি তার তেরটি ছেলেমেয়ের তেরোজোড়া ছেঁড়া বিবর্ণ জুতা-চটি সারাটা ব্যাল্‌কনি জুড়ে শুকোতে দিলে।

রুচি ও শুচিতা, লজ্জা ও শোভনতার এসব বিজ্ঞাপন দেখতে দেখতে বসুধার চোখ জুড়িয়ে যায়। তাই ঘাড ফিরিয়ে সে তাকায নিজের ঘরের দিকে। নতুন চুনকাম করা মেঘের মতো শাদা ধবধবে দেয়াল। অতিরিক্ত পয়সা খরচ করে বসুধা এই সেদিন ঘরের রং ফিরিয়েছে। বলতে কি এ-বাড়িতে ঢুকতে চল্টা-ওঠা পানের পিক ছিটানো দেয়াল আর সিঁড়িগুলি পার হয়ে ওপরে উঠে আসতে বসুধার যেন মরে যেতে ইচ্ছা করে। যতক্ষণ না সে তার ছিমছাম নিরিবিলি এই বারান্দা, ঠাণ্ডা ঘর, আর টব-ভরতি সাদা নীল ফুলগুলির পাশে এসে বুক ভরে নিঃশ্বাস ফেলতে পারে। তার ঘর, তার স্বপ্ন, মণিমালার ছোট ছোট নিঃশ্বাসে ভরা অপরূপ জগত! বসুধা এখানে এসে বাঁচে।

ভাবতে ভাবতে, বারান্দায় অনেকক্ষণ পায়চারি করার পর ঘড়ির কাঁটা যখন তিনটার দাগ পার হয়ে গেছে, টবের একটা সন্ত-ফোটা অর্কিডের সামনে এসে সে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

রৌদ্রের রং বাদামী হয়েছে, মণিমালা এখনও ফিরল না, এইবার বেলা শেষ হবে। কিন্তু বসুধা এতটুকু ভাবল না। বরং হলদে সোনালী অর্কিডের গা বেয়ে নীল নিঃশব্দ একটা পোকার আস্তে আস্তে একদিকে সরে যাওয়া দেখতে দেখতে বসুধার অন্য কথা মনে হল এখন।

না, এর সবটাই কষ্ট পাওয়ার ইচ্ছায় নয়। বসুধা দেখল, রৌদ্রের রং-ফেরার মতোই খুকীর মনের পরিবর্তন।

বাইরে রৌদ্রের নিচে সুন্দর হয়ে একদিন হাঁটবার ইচ্ছা কি এই বয়স থেকেই হয়না মেয়েদের। বরং এর অনেক আগেই হয়েছে এ-বাড়ির চকোর চামেলীর লোটন বাসন্তীর। দল বেঁধে ওরা ফি শনিবার সিনেমায় যায়, লেকে পার্কে।

পাউডার ক্রিমের শ্রাদ্ধ।

ফ্যাশন কায়দার অত্যাচার।

অথচ এই শ্রী এই ভূষা। পুরোনো হয়ে গেছে ওদের বাইরে যাওয়া, তবু রোজ বাইরে টো-টো করতে বেরোনো চাই।

আর সেই তুলনায় খুকীর আজ বাইরে যাওয়ার ইচ্ছা কত ধীর কত বিলম্বিত। আকাশে চাঁদ ওঠার মতো। বসুধা মনে মনে দেখল মণিমালা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে চুল বেঁধেছে, সাজগোজ করেছে। দুলের সঙ্গে রুলি মানাবে না বলে চুড়ি পরেছে, রীবনে কাজ নেই আজ তাই খোঁপায় গুজেছে রূপোর ডবল কাঁটা।

রূপোর কাঁটায় চৈত্রের বিকেলী রোদ হ্রদের জল হয়ে টলটল করছে, বসুধা এখানে দাঁড়িয়ে দেখতে পেল।

কিন্তু কোথায় ও যাবে।

এ-বাড়ির চকোর চামেলীর অনেক বন্ধু, খুকীর একটিও নেই, দেখেনি সে কোনোদিন। কাজেই সহপাঠিনী কোনো মেয়ের বাড়ি পা বাড়াবে বলে একটু আগে বসুধার মনে যে-কথাটা উঁকি দিয়েছিল এখন তা-ও মিলিয়ে গেল। আর দোকানেই বা ও যাবে কেন। দোকানে গেলে এতক্ষণে খুকী ফিরে আসত। আর কী আছে সেখানে। দোকানে

জিনিস নেই সেকথা নয়, এমন কি মনের মতো সামগ্রী আছে যে খুকী পছন্দ করে নিয়ে আসবে ? ওর যা পছন্দ মণিমালা চাইবার আগে বসুধা এনে মেয়ের হাতে তুলে দেয়, দিয়েছে এতকাল। সত্যি মণিমালা আজ অবধি মুখ ফুটে কিছু চায়নি। বসুধা এত বেশি এনে দিয়েছে যে ওর চাইবার ফুরসৎ ছিল না। আর বসুধা জানে ওর পছন্দ, ওর মন কি চায়। বসুধার নিজের হাতে গড়া এই মন।

না দোকানে নয়। এমনি। এমনি মণিমালা বেড়াতে বেরিয়েছে। ফুলের গা বেয়ে নীল পোকার নিঃশব্দ সঞ্চরণের মতো চৈত্রের পড়ন্ত বেলায় খুকী নিজের মনে হাঁটছে। টব থেকে চোখ সরিয়ে বসুধা বাইরে দেবদারু পাতাদের শেষ রৌদ্র-পান দেখতে লাগল। একটু পরে ওখানে অনেক পাখি এসে ভিড় করবে। বসুধার মনে পড়ল খুকী এসময়ে গা ধোয় চুল বাঁধে। আর বিকেলের ডিউটিতে বেরোবার জন্যে বসুধাও তৈরী হয়, কাপড়জামা পরে। চাকরটার ফিরতে সেই সন্ধ্যা হয় বলে রোজ বেরোবার আগে বসুধা স্টোভ জেলে খুকীর বিকেলের খাবার লুচি সুজি মামলেট যাহোক একটা কিছু করে রেখে যায়। মেয়ের বিছানা করে রাখে আলোটা নামিয়ে দেয় টেবিলে। সন্ধ্যা হতে খুকী পড়বে। পড়বে অথবা ঘুমোবে। বসুধা কতদিন রাত্রে হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে দেখেছে টেবিলে মাথা রেখে ও ঘুমোচ্ছে। আলোর শেড্-এর নীচে এলোমেলো অন্ধকার চুলের ঢেউ, আর, ঢেউয়ের মাঝখানে মোমের দীপের মতো ঘুমে-ভরা ছোট্ট একটি মুখ সুন্দর হাঁ করে আছে।

টের পেয়ে ওর ঘুম ভেঙ্গে গেছে। নিজের কাপড়জামা ছাড়বার আগে বসুধা বাতির ঢাকনা তুলে দিতে গেছে, করমচার মতো লাল গোল চোখে খুকী ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়েছে মা'র দিকে, যেন হঠাৎ ও আন্দাজ করতে পারছে না রাত কত হল। কত আর রাত হয় বসুধার ডিউটি থেকে ফিরতে। মেয়ে এর মধ্যেই ঘুমে মুড়মুড়ে।

সেই লাল করমচা-চোখ এখন বিকেলের আলোয় কেমন রং ধরেছে বসুধার দেখতে ইচ্ছা হল।

আচ্ছা, মণিমালা কি সিনেমায় যাবে! কথাটা ভাবতে অবশ্য বসুধার বেশ হাসি পেল। সিনেমায় যাবে রেস্টুরেণ্টে যাবে! লোটন বাসন্তীর যা চিরদিনের প্রিয়। আ,—সত্যি যদি জানতো এ-বাড়ির মায়েরা কি মেয়েরা খুকীর রুচি। ওরা জানেনা, বসুধা এসব নিজে যেমন পছন্দ করে না তেমনি মেয়েও ভালবাসে না। কাজেই এসম্পর্কে একরকম নিশ্চিন্ত সে। বসুধা আস্তে আস্তে চলে এল ঘরে।

তার ঘড়ির কাঁটায় এখন পাঁচটা পঁয়ত্রিশ।

বাইরের সবটুকু রোদ প্রায় নিভে গেছে।

চাকরটাও ফিরেছে যেন, রান্নাঘরে বাটনা বাটার শব্দ শুনল বসুধা। কিন্তু ওদিকে উঁকি দিতে একফোঁটা ইচ্ছা নেই, বেশ লাগছিল তার এঘরের এই আবছা অন্ধকারে। বসুধা আলো জ্বালল না। দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। এমন আর কোনোদিন হয়নি। এমন আর কোনোদিন হয়েছে কি, একটু একটু করে সন্ধ্যা নামছে, আর সেই সকালের কাপড় জামা জুতা পরা অবস্থায় অস্নাত অভুক্ত বসুধা ঘরে, খুকী নেই!

অদ্ভুত এক অনুভূতিতে বসুধার মন ছেয়ে গেছে।

কিন্তু খুকী কি ভাবছে যেহেতু ঝোঁকের মাথায় বেশিদূর বেড়াতে গিয়ে ফিরতে ওর রাত হচ্ছে, মা রাগ করবে বকবে?

কথাটা মনে হতে বসুধার হাসি পেল। ও কি জানে না ওর মাকে। লোটন বাসন্তীর মা নয় তোমার মা, আর, লোটন বাসন্তী কি চকোর চামেলী তুমি নও, খুকী। বসুধার যেন জোরে জোরে বলতে ইচ্ছা হল অন্ধকারে অদৃশ্য মণিমালাকে সম্বোধন করে।

এসব ভাবল ও, আর অন্ধকার ঘরে পায়চারি করতে করতে কান খাড়া করে রাখল। খুকীর জুতোর শব্দ শুনবে বলে নয়, শুনছে সে নিচে দোতলায় চকোর চামেলীর রাত করে ঘরে ফেরা নিয়ে হেমগিন্নীর তর্জন গর্জন আস্ফালন বিক্ষোভ।

আ, কতদিন পর মণিমালা বেড়াতে বেরিয়েছে, যদি ওর ফিরতে রাত দশটাও হয় বসুধা কি রাগ করবে মেয়ের ওপর। ওর যে আজ বাইরে যাওয়ার ইচ্ছা হয়েছে এই কি যথেষ্ট নয়?

না, এই গিন্নীরা, নিচের মহিলারা মেয়েদের জন্যে যতবেশি যন্ত্রণা ও নিগ্রহ ভোগ করল তার শতভাগের একভাগও যদি বসুধা পেতো মণিমালাকে দিয়ে! সার্থক তার মা হওয়া, বলল ও মনে মনে আর খুকীর মতো মেয়ে পাওয়া। খুকী খুকী।

আটটা বাজল। ন'টা।

রেডিও বাজল রেডিও বন্ধ হল।

নিচে ফ্ল্যাটগুলিতে সাড়াশব্দ কমে এসেছে আস্তে আস্তে।

বৈঠকখানায় বুড়োদের কাশির শব্দ আর শুনছেনা বসুধা। যেন ওঁরা মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছেন, এবেলা বসুধা নিচে নামেনি তাই ?

চাকরটা এই মাত্র রান্নাঘরের দরজার শিকল তুলে দিয়ে চলে গেল। তারপর সারা বাড়ি নিঃসাড়।

জানালার নিঃশব্দ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে বসুধা শুনছিল বাইরে দেবদারুর মাথায় হাওয়ার শব্দ।

ঠিক তখন। তখন শোনা গেল সিঁড়িতে জুতোর শব্দ। আর পরমুহূর্তেই একশ পাওয়ারের দু'টো বাল্‌ব জ্বলে উঠল বসুধার ঘরে বারান্দায়, আলোর বন্যায় ভেসে গেল চারদিক।

কাজলপরা হরিণ-চোখ মেলে হাসছে মণিমালা।

টিয়ার পালকের মতো সবুজ ওর শাড়ি।

মুক্তা হয়ে জ্বলছে মোমের মতো শরীর। দেখল বসুধা সুইচ্‌বোর্ড থেকে হাত নামাতে নামাতে। আর কতক্ষণ সে চোখ ফেরাতে পারল না।

কথাবার্তায় রাত বারোটা বাজল মা মেয়ের খেতে বসতে। নিশুতি রাত। মুখোমুখি বসেছে দু'জন। আর খেতে খেতে গল্প হচ্ছে। হঠাৎ আবার কি মনে হতে বসুধা জিজ্ঞেস করল, 'তোকে ও চিনল কি করে খুকী বল তো!'

'বা রে, আমায় দেখেই যে কর্ণেল করঞ্জীলাল গাড়ি থামাল।'

'তারপর ?'

'বললে, নার্স বসুধার মেয়ে তুমি ?'

'তারপর ?'

'আমায় গাড়িতে টেনে তুলল।'

'তারপর? কোথায় গেলি তোরা?' যেন বসুধা গল্পটা আবার শুনতে চাইছে, এমনভাবে হেসে মেয়ের দিকে তাকাল।

'প্রথম গ্র্যাণ্ড-হোটেল তারপর গঙ্গার ধার, ইডেন গার্ডেন। সারাটা সার্কুলার রোড দু'বার চক্কর, তারপর আবার হোটেল হয়ে এই তো আমায় নামিয়ে দিয়ে গেল দরজায়।'

'বুড়ো হয়েছে চুল পেকে গেছে তবু তো ছুটোছুটি কমল না রে।' রুদ্ধ নিঃশ্বাস ফেলে বলল বসুধা।

'বুড়ো হয়েছে।' মৃদু হেসে খুকী চেয়ারের পিঠে মাথা রাখল। 'বুড়োয় বুড়োয় কি তফাৎ নেই মা। এ-বাড়ির কুশল রায় হেম লাহা তো বুড়ো হয়েছে, দেখলে কি ঘিন্‌ঘিন করে না গা বমি ধরে না!'

'সত্যি বলেছিস।' নিবিড় হেসে বসুধা মাথা নাড়ল। 'আমায় একটা ব্রোচ্ প্রেজেন্ট করেছিল ও, সেই কবের কথা।'

'আমায় বললে তোমার রঙের সঙ্গে এই পাথর মানাবে ভাল, তাই এই পাথরের আঙ্‌টি।'

এই প্রথম একটি রাত যে এত রাত অবধি জেগে থেকে খুকী বসুধার সঙ্গে একত্র খেতে বসেছে, ভাল লাগছিল বসুধার। খুকী বড় হয়েছে, বড় হয়েছে, বারবার তার মন বলছিল, আর খেতে খেতে একসময়ে বলল সে মণিমালার সুন্দর ভুরুর দিকে চেয়ে, 'বাড়ি খুঁজে পাচ্ছিনা, এখানে থেকে তো আর সম্ভব না, আরো বড় সার্কেলে তোমায় আমি পরিচয় করিয়ে দিতে পারতাম, মালা।'

'কিন্তু—' কি বলতে গিয়ে মণিমালা থামল।

'কি বলছিলে বলো না।' অভয় দিলে বসুধা মেয়েকে।

'ওরা কি সবাই এমন বুড়ো?' খুকী মা'র চোখের দিকে তাকাল। যেন হঠাৎ ধরতে না পেরে বসুধা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল মেয়ের মুখের দিকে। এখনও ওকে এক এক সময় এমন শিশু মনে হয়, ভাবল সে।

চতুর্বিংশতি

চৈত্র মাস। গাছ নেই, পাখি নেই, ফুল নেই, আকাশ সঙ্কীর্ণ। তবু হ্যারিসন রোডের এই হাওয়াটা অদ্ভুত ভাল লাগছিল মল্লিকার, ভাল লাগছে হারিনের হোটেলে, ওর তেতলার কামরায়, ওর বিছানার ওপর চুপচাপ বসে জানালার বাইরে চেয়ে থাকতে।

মল্লিকা জানালা দিয়ে কলকাতার ধূসর আকাশ দেখল কতক্ষণ, তারপর হারিনের দিকে মুখ ফেরাল। 'এখানে এলে আমি সব কিছু ভুলে যাই, এখানে এসে ভাবতেই পারি না আমি শিলিগুড়ি ফিরে যাব, হারি।' একটু থেমে মল্লিকা আবার জানালায় চোখ রাখল, যেন নিজের মনে বলল ও কথাগুলি, 'অথচ ফিরে যেতে হবে, যদ্দিন সিভিল সার্জন রঞ্জিত রায় বেঁচে আছে আমায় ফিরে যেতে হবে ওর কাছে।'

'তুমি রঞ্জিতের স্ত্রী, আইনত তা-ই তো করতে হবে তোমায়, তা ছাড়া—' আস্তে আস্তে বলছিল হারিন, মল্লিকা দপ করে জ্বলে উঠল।

'আইন আমি মানি না, হারি, আইন ভাঙব, ভেঙেছি।'

হারিন নিরুত্তর।

মল্লিকা অসহ্য আবেগে মাথা নেড়ে বলল, 'কি, চুপ করে আছ কেন তুমি, বল।'

চুপ থেকে হারিন একটা সিগারেট ধরায়। মল্লিকা তার উরুর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। 'বল, কোনো কথা বলছ না কেন।'

মল্লিকা অস্ফুট আর্তনাদ করে। হারিন আধশোয়া, মল্লিকার শরীরের মৃদু মধুর তাপ তার বুকের কাছ পর্যন্ত ভেসে আসে। হারিন চোখ বুজে সিগারেটে টান দেয়। একটু পরে সে টের পেল মল্লিকা কাঁদছে। গরম জলের ফোঁটা পড়ছে তার শরীরে।

'ছি, কাঁদে না, কাঁদবার হয়েছে কি।' হারিন তাড়াতাড়ি মল্লিকাকে সোজা করে বসায়। 'কাঁদছ কেন শুনি?'

'না কাঁদব কেন, কান্নার আছে কি।' মল্লিকা দেয়ালের দিকে চোখ রাখল। 'দিব্যি আছ হোটেলে, নিরিবিলি, নির্ঝঞ্ঝাট। পারিবারিক জীবনের তুমি জান কি, কি বুঝবে স্বামী স্ত্রীর—'

'এই ছাখো।' হারিন হাসবার চেষ্টা করল। 'এটা তোমার বাড়াবাড়ি, মলি। পারিবারিক জীবন, স্বামী-স্ত্রীর জীবনে কি আছে, কি থাকা উচিত, কি উচিত না, তা জানি বলে কি কোনোদিন তোমায় বলেছি আমি যে—'

'না, আমিই বলছি, সত্যি তুমি জান না কি করে জানবে, তুমি তো বিয়ে করোনি।' হারিনের চোখে চোখ রাখল মল্লিকা। 'স্বামী-স্ত্রীর জীবনের কথা তুলে খামোকা তোমায় বিরক্ত করা।' কথার শেষে অদ্ভুত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মল্লিকা।

হারিন চোখ নামাল।

'আর আসব না, আর বলব না।' বলল মল্লিকা একটু পর।

'ভদ্রলোক এমনি তো খুব ভালমানুষ।' হারিন বলল ঢোক গিলে।

'ভালমানুষ শুধু?' মল্লিকা শুকনো হাসল। 'ভাল স্বামী নিশ্চয়ই। আইডিয়্যাল হাজবেণ্ড।'

'তবু তুমি'—হারিন হাসিতে যোগ দিতে যাচ্ছিল মল্লিকা গম্ভীর হয়ে গেল। গম্ভীর গলায় আস্তে আস্তে বলল, 'মিথ্যা বলে লাভ কি। দু'বছর বিয়ে হয়েছে, দু'বছরে না হলেও দশ রকমের সোনার জিনিস ও আমায় প্রেজেণ্ট করেছে। হ্যাঁ, ব্যাঙ্কে আমার নামে এর মধ্যেই বেশ মোটা রকমের একাউণ্ট খোলা হয়েছে। নতুন জমি কিনে যে বাড়ি তৈরী হল তাতেও আমি রয়েছি, আমার নামে বাড়ি, মল্লিকা-কুঞ্জ।'

'তাই বল।' হারিনের দুই চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

'দাঁড়াও, শেষ করতে দাও?' মল্লিকা সোজা হয়ে বসল। 'হ্যাঁ, কলকাতার গাড়ি ধরতে দু'দিন পর পর আমায় স্টেশনে ছুটতে হয়, তাই সেদিন নতুন গাড়ি কেনা হল। আমার জন্যে। সেবার শিলিগুড়ি স্টেশনে নেমে দেখি ডাক্তারের পুরোনো টমটম নয়, মেঘরঙের স্টুডিবেকার দাঁড়িয়ে আছে আমায় ঘরে নিয়ে যেতে। আমার জন্যে চারটে চাকর-চাকরাণী—'

'তবে কেন তুমি,' মল্লিকার সুখের ফিরিস্তি শুনতে শুনতে যেন খুশী গলায় হারিন বলল, 'তবে কেন আর—'

'মল্লিকা কাঁদে, কাঁদছে, কি চাইছে ও, কী ওর অভাব? তাই না?' মল্লিকা খাটের ওপর আবার এলিয়ে পড়ছিল, দ্রুত দীর্ঘ হাতে হারিন ওকে সোজা করে বসায়। 'এই ত্যাখ পাগলামী, আমি কি বলেছি, আমি কি বলি যে তোমার কোনো দুঃখ নেই, কোনো দুঃখ থাকতে পারে না মনে—'

ক্লান্ত অবসন্ন হরিণীর মত হারিনের বাহুর মধ্যে মাথা রেখে মল্লিকা আস্তে আস্তে বলল, 'তবে একটা ব্যবস্থা কর, না আর দেরি নয়।'

মল্লিকার গালের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে হারিন বলল, 'করব। করব না আমি বলিনি কোনোদিন, মলি।'

'কবে করবে, কখন করছ?'

চুপ ক'রে রইল হারিন।

'তুমি করবে, তুমি করেছ।' সূক্ষ্ম অবিশ্বাসের হাসি দেখা গেল মল্লিকার ঠোঁটের প্রান্তে। হারিনের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মল্লিকা জানালার দিকে মুখ ফেরাল। 'তুমিই কি বলেছিলে না, বিয়েটা হোক, বিয়েতে কি যায় আসে, আমি তো রইলাম মলি। মনে আছে?' হারিনের চোখে চোখে তাকায় মল্লিকা।

'আমি কি সত্যি আছি না, মলি?'

'আছ, তুমি আছ তাই দিন শেষ হতে না হতেই আমায় গাড়ি চাপতে হয় শিলিগুড়ির।'

'যথা নিয়মে সাধ্বী পত্নীর গৃহ-প্রত্যাবর্তন, না কি গৃহপরিবর্তন?' হারিন একটু হাসতে গেছল, মল্লিকা কঠিন হয়ে গেল।

'দু'বছর আগে ফাঁকি দিয়েছিলে, গরীব, এই মাইনে পেয়ে বিয়ে করা পোষায় না। মনে আছে বলেছিলে কবে?'

'দু'বছরেও কিন্তু আমার রোজগার দু'শ টাকার ওপরে উঠল না।' কাতর শোনাল হারিনের গলা।

'আবার সেই টাকা।' যেন অস্ফুট যন্ত্রণায় মল্লিকা আঃ করে উঠল। 'টাকা, টাকাই যদি কাম্য হবে ফি শনিবার তোমার কাছে ছুটে আসব কেন, কেন আসি তা কি বোঝনা, আশ্চর্য।' মল্লিকা উঠে দাঁড়াল।

'বেশ, কি করতে হবে বল, আমি প্রস্তুত।' গলা শক্ত করল হারিন।

'শোন কথা।' হারিনের হাতে হাত রাখল মল্লিকা। 'এবার আমি ডোভারলেনে উঠিনি।'

'মানে তোমার মামাবাবু মামীমার সঙ্গে দেখাই করোনি ?'

'না, শেয়ালদা থেকে সোজা চলে এসেছি তোমার হোটেলে। সারাদিন থাকব তোমার কাছে। পাকাপাকি একটা ব্যবস্থা আজ আমরা করব।'

একটু চুপ থেকে হারিন পরে আস্তে আস্তে বলল, 'এটা কি খারাপ হল না, কলকাতায় এসেছ অথচ ওখানে না-গিয়ে একেবারে এখানে—'

'আহা, আর এমনি বুঝি ওরা টের পায় না। কলকাতায় এসে কতক্ষণ আমি মামাবাবুর বাসায় থাকি, ক'ঘণ্টা আমাকে ওরা বাসায় দেখে, সারাদিন তো তোমার এখানেই—'

'ওরা জানে এখনো আমি হোটেল জেনিথ্-এ আছি ?' হারিন অল্প হাসল।

'হ্যাঁ গো হ্যাঁ। ওরা সবই জানে। দু'বছর মল্লিকার বিয়ে হয়েছে, এখনো ঘন ঘন ও কলকাতায় আসে কেন, কিসের আকর্ষণ, কার আকর্ষণ, মামাবাবু না পাক বুদ্ধিমতী মামীমা বেশ টের পায়। একদিন তো আমায় মুখের ওপরই বললে—,' অনেকক্ষণ পর মল্লিকাও একটু হাসল।

'তুমি কি বললে তার উত্তরে ?' হারিনের চোখে কৌতূহল।

'নাও আর দেরি নয়, চট্ করে জামাটা চড়িয়ে নাও তো, এবার বেরোনো যাক।' ব্লাউজের বোতাম লাগাতে লাগাতে মল্লিকা যেন নিজের মনে আর একটু হাসল। 'বলব আর কি, বলার আছে কি।'

'টাকা পয়সায় মেয়ের মন নেই, তোমার মামীমা মামাবাবু এখন ভাল করেই বুঝছে তা হলে?' যেন নিজের মনেই প্রশ্ন করল হারিন। তার সারা মুখে তৃপ্তির ছাপ।

'ওদের বোঝাবুঝিতে কী যায় আসে আমার, তোমার। আমরা যা ভাল বুঝি করবই।' খোঁপা ঠিক করবার জন্যে মল্লিকা আয়নার সামনে দাঁড়াল।

জামা কাপড় পরে নেয় হারিন।

'বোটানিক্যাল গার্ডেন তো?' খোঁপা ঠিক করা শেষ করে মল্লিকা শাড়িতে কুঁচি দেয়। 'সত্যিই দু'জন নিরিবিলি কতক্ষণ কাটাবার মতো এমন আর একটি জায়গা নেই পৃথিবীতে।' গুনগুন করছিল মল্লিকা।

হারিন একটু সময়ের জন্যে তন্ময় হয়ে জানালার বাইরে চোখ রেখে ট্রামের তার দেখছিল কি বোটানিক্যাল গার্ডেনের ছবি আঁকছিল মনে মনে। না, তার দুই ভুরুর মাঝখানে সূক্ষ্ম কালো রেখা? মল্লিকার চোখ এড়াল না।

'কি তুমি ভাবছ শুনি?' প্রশ্ন করল মল্লিকা।

কপালের রেখা মুছে ফেলে হারিন হাসল।

'ভাবছি, সিভিল সার্জন কি টের পায়না দু'দিন পর পর তুমি কেন কলকাতা—'

'আবার সেই।' অসহ্য বিরক্তিতে মল্লিকা ঠোঁট কামড়াল। 'ওকে কি তুমি আমায় ভুলতে দেবে না, ওর কথা—'

'তোমায় মনে করতে গেলেই যে ও মনে আসে।' হারিনের ঠোঁট কাঁপছিল।

'যাতে আর মনে না আসে সেই ব্যবস্থাই তো করছি আমরা।' গলা শক্ত করল মল্লিকা। 'কাপড় পরা হয়েছে তোমার? এবার ট্যাক্সি ডাকো।' বলে ও একটা স্যুটকেইশের ডালা খুলল। এতক্ষণ খেয়াল করেনি হারিন মল্লিকা ওর স্যুটকেইশ সঙ্গে এনেছে।

'তোমার চায়ের পেয়ালা আর কাঁচের গ্লাসটা দাও।' বাক্সের অন্য কি সব জিনিস গুছোতে গুছোতে মল্লিকা বলল, 'হ্যাঁ, তোমার তোয়ালে-টারও দরকার।'

হারিন একটু অবাক।

'কি হবে পেয়ালা গ্লাস তোয়ালে দিয়ে?'

'যা বলছি কর না বাপু। কই দাও।'

হারিন হাত বাড়িয়ে মল্লিকার হাতে সব তুলে দেয়। মল্লিকা সেগুলি স্যুটকেইশে রাখে।

'তোমার তো স্টোভ নেই, স্পিরিট বা রাখবে কেন।' মল্লিকা বাক্সের চাবি আটকায়। 'রাস্তায় কিনে নিলেই চলবে। সমস্ত শিলিগুড়িতে আমি কাল বিকেলে এক ফোঁটা স্পিরিট পেলাম না।' সাদা সুন্দর দাঁতে মল্লিকা হাসল।

হারিন এতক্ষণ পর বুঝল।

'পিকনিক হবে?'

'হ্যাঁ চড়ুইভাতি।' হাত বাড়িয়ে হারিনের কপালের একটা

চুল সরাতে সরাতে মল্লিকা বলল, 'তোমায় হরিণের মাংস রেঁধে খাওয়াব।'

'হরিণ?' হারিন চমকে উঠল। 'কোথায় পেলে হরিণ?'

'কাল শিকার করা হয়েছে।' হারিনের চোখের ভিতরে তাকাল মল্লিকা। 'মামাবাবুর নাম করে শালপাতায় জড়িয়ে তোমার জন্যে একটু নিয়ে এসেছি।' কথার শেষে ছোট খুকির মত মল্লিকা হি হি করে হাসল। হারিনও হাসল। কে হরিণ শিকার করেছে একথা হারিন জিজ্ঞেস করল না, মল্লিকাও বলল না। শিকারী উহ্য থেকে গেল দু'জনের মাঝখানে।

'যাও, আর দেরি করো না, ট্যাক্সী ডাকো।' তাড়া দিলে মল্লিকা।

'যাই, এখুনি ডেকে আনছি।' রুদ্ধশ্বাসে মল্লিকার গলার কাছে এক মুহূর্ত চুমু খেয়ে হারিন তরতর করে নিচে নেমে গেল।

মল্লিকা আয়নায় মুখ দেখল ততক্ষণ।

কতক্ষণের রাস্তা আর গার্ডেন।

দেখতে দেখতে দু'জন এসে গেল অফুরন্ত রৌদ্র, ছায়া, পাখি আর গাছের দেশে। টুকরো টুকরো নীল আকাশ।

উত্তেজনায় মল্লিকার খোঁপা খুলে যায়।

তাড়াতাড়ি ও নরম ঘাসের ওপর, ঘন ছায়ায় রঙীন ফুরফুরে গন্ধমাখা সুজনি বিছায়।

'রান্নার আগেই বিছানা, খাওয়ার আগেই শোয়া?' হারিন ঠাট্টা করল।

'একি ঘরবাড়ি যে নিয়ম মাফিক চলব।' মল্লিকা ভুরু কোঁচকায়।

'ভাল।' হারিন জুতো খোলে।

'তোমার হোটেলের বিছানার চেয়ে খারাপ হয়েছে কি?' কি ভেবে খোঁচা দিলে মল্লিকা।

হারিন লজ্জিত চোখে মল্লিকার চোখের দিকে তাকায়। 'আমি যে গরিব,—গরিবের বিছানা—'

'নাঃ,' মল্লিকা আকাশের দিকে মুখ ফেরায়। 'তোমার সঙ্গে কথা কয়ে একবিন্দু যদি সুখ পেতুম। ওসব কথা ওঠে কেন।'

হারিন চুপ।

মল্লিকা বললে, 'এসো।' জুতো খুলে ফেলেছে সেও। পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে পা রাখে ঘাসের বিছানায়। হারিন পাশে বসে।

একটু পর, যেন কথার মোড় ঘোরাবার জন্যে আস্তে আস্তে হারিন বলে, 'সত্যি, কী যে এক হোটেল।'

মল্লিকা বুঝল কিসের ইঙ্গিত।

'আমার দুরদৃষ্ট।' সুন্দর সাদা দাঁতে ও হাসে।

'না আমার।' করুণ গলায় বিড়বিড় করল হারিন। 'একদিন, একটা রাত তোমায় ওখানে রাখলে কী যে মহাভারত অশুদ্ধ হয়—'

'ওরা বুঝি মেয়েমানুষকে জায়গা দিতে আপত্তি করে?' মল্লিকা ঠোঁট মোচড়ায়।

'না আপত্তি নয়, আপত্তি করবার কে।' গলা শক্ত করল হারিন। একটু থেমে নিচু গলায় বললে, 'তবু তো,—বুঝলে না?'

কি যেন বুঝল মল্লিকা, কি জানি বুঝল না। একটুক্ষণ আকাশের দিকে চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে বললে, 'কি পরিচয় দাও আমার হোটেলে শুনি?'

'বলি, আমার এক বোন, দেখা করতে আসে।'

'তাই নাকি?' মল্লিকা আর হাসল না। 'যাকগে, এখানে তো আর সেসব ভয় নেই। এখানে যতক্ষণ আমরা আছি ততক্ষণ আমরা আমরাই।' হারিনের কোলের ওপর মাথা রাখল মল্লিকা। 'তাই নয় কি?'

হারিন মাথা নাড়ল। মল্লিকার চুলের ভিতর আঙুল চালায় ও আস্তে আস্তে।

শুকনো পাতার ওপর খস্‌খস শব্দ হতে চমকে উঠল দু'জন। একটা কাঠ-বিড়াল। মল্লিকা মাথা নামাল। হারিন ঘন হয়ে এল ওর শরীরের কাছে।

'একটা ঘরটর দেখ।' বলল মল্লিকা।

হারিন নীরব।

'শহরের ওপর না পাওয়া যায় শহরতলীতে মন্দ কি। একতলা? বেশ তো, রান্নাঘর, কল, পায়খানা নিয়ে কত আর ভাড়া একটা ঘরের শুনি?'

হারিন চুপ।

'কথা বলছ না যে? ওর বুকে নাড়া দেয় মল্লিকা।'

'ভাবছি, ভাবছিলাম—' বলতে বলতে হারিন আবার থামল। অন্যদিকে মুখ ফেরাল।

'বল, বল না শুনি।' মল্লিকা ঘাড় তুলল। 'কিসের ভয়, কার ভাবনা আমি জানব না?'

হারিন ওপরের দিকে তাকায়।

'স্বেচ্ছায় যে আসে তার সম্পর্কে কোনো কথা ওঠে না, কেউ আটকাতে পারে না তাকে, বুঝলে। এর মধ্যে ভাবাভাবির কিছু নেই।' মল্লিকা উত্তেজনায় প্রায় উঠে বসল।

'না, তা নয়।' ছোট্ট নিশ্বাস ফেলল হারিন।

'তবে কি?' গলার স্বর নামালো মল্লিকা। 'কি ভাবছ পরিষ্কার করে বল তা হলে।'

'আমার শরীরটা তেমন ভাল নেই।' নিস্তেজ হাসল হারিন। আর মল্লিকার দিকে চেয়ে রইল।

'তাই বল।' বুদ্‌বুদের মতো হাসি উঠে এল মল্লিকার বুক থেকে। 'শরীর ভাল নেই, সংসার পাতছো বলে অতিরিক্ত পয়সা রোজগারের জন্যে বেশি খাটতে হবে, সেই ভাবনা? পয়সায় আমাদের দরকার নেই, বললাম তো। বেশ তো, দরকার হয় আমি চাকরি করব। চাকর রাখতে পারব না? ঘরের কাজকর্ম বাজার করবার ভাবনা? আমি খাটব। আমি আমি আমি।' এক নিশ্বাসে অনেকগুলি কথা বলে মল্লিকা হাঁপায়। আস্তে আস্তে, গাছের পাতার দিকে চোখ রেখে পরে বলল, 'শরীর,— শরীরই কি সব? তার জন্যে ভাবনা?'

হারিন আর কিছু বলল না।

চৈত্রের এলোমেলো হাওয়া জেগেছে তখন। পাতার শব্দ হচ্ছে। একটা পাখি ডেকে উঠল মাথার ওপর।

'তুমি ততক্ষণ সিগারেট খাও।'

'এখন রান্না করবে?'

কথা না কয়ে মল্লিকা শয্যা ছেড়ে উঠল। কাপড় ঠিক করল। নতুন করে চুল বাঁধল। তারপর স্যুটকেইশ থেকে বার করল দামি সিগারেটের টিন।

'লুকিয়ে তিন টিন এনেছিলাম তোমার জন্যে।' টিন ঠেলে দিলে মল্লিকা হারিনের কোলের কাছে।

'তুমি এলে এত সিগারেট খাই।' মল্লিকার চোখে চোখ রেখে হারিন নিঃশব্দে হাসল।

'আর কিছু খাও না?' মল্লিকা ঠোঁট টিপল।

'হ্যাঁ, এখন মাংস খাব।' হারিন জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল।

'খারাপ শরীর নিয়ে কতটুকুন-বা খাবে।' চোখের অদ্ভুত ভঙ্গি করে মল্লিকা ফের নুয়ে পড়ল বাক্সের ওপর। বাক্স থেকে বেরিয়ে এল ছোট্ট ঝক্‌ঝকে সস্‌পেন, স্টোভ, স্পিরিটের বোতল, বাটি, গ্লাস, মাখনের টিন, পাতায় জড়ানো হরিণের পাঁজর।

'কই, দেশলাই দাও।' স্টোভে স্পিরিট ঢেলে মল্লিকা মুখ তুলল। হারিন হাত বাড়িয়ে দেশলাই দেবে, মল্লিকা নেবে, এমন সময় টুপ করে দেশলাই মাটিতে পড়ে গেল। কেন না দু'জনেরই চোখ চলে গেছে একদিকে, ঝাউয়ের ছায়ায়।

'প্রিম্‌রোজ অর্গ্যাণ্ডি।' মেয়েটিকে দেখবার আগে, ওর ব্লাউজের ছিট দেখা শেষ করল মল্লিকা, তারপর হারিনের দিকে চোখ ফেরাল।

হারিন বলল, 'আমি চিনি না।' প্রিম্‌রোজ অর্গ্যাণ্ডি কাপড় এই সে নতুন দেখছে।

'তুমি কি-ই-বা চেন।' মল্লিকা সাদা জিপ্ থেকে বেরিয়ে আসা পুরুষকে দেখল এবার, দেখেই চিনল। 'ও, লাহিড়ী!'

'তুমি চেন নাকি?' পিছন থেকে হারিন বলল।

'শিলিগুড়ির ইঞ্জিনীয়ার নীরেন লাহিড়ী। বৌ নিয়ে বাগান দেখতে এল।' মল্লিকা হারিনকে বুঝিয়ে দিলে।

হারিন দেখল কুকুর, খুকু, স্ত্রী, আয়া, গ্রামোফোন, স্টোভ, বড় একটা মাছ, ঘিয়ের বোয়ম এবং একটা বালিহাঁস সঙ্গে নিয়ে লাহিড়ী সাহেব চড়ুইভাতি করতে এসেছেন বোটানিক্যাল গার্ডেনে। চৈত্রের দুপুর রোদ চিড়চিড় করছে।

'শখ আছে ভদ্রলোকের যা-হোক।' মল্লিকা হাসল।

'তোমার সঙ্গে পরিচয় আছে?'

'পরিচয় মানে!' মল্লিকা অবাক হল হারিনের দিকে চেয়ে। 'ওর খুব বন্ধু যে।'

'সিভিল সার্জনের?' হারিন প্রশ্ন করল।

ঘাড় নেড়ে মল্লিকা ফের চোখ ফেরাল ঝাউতলার দিকে।

'যাবে নাকি?' ঢোক গিলল হারিন।

'নিশ্চয়ই।' চোখ বড় করে মল্লিকা বলল, 'এত কাছাকাছি এসেছে, দেখা না করাটা ভারি বিশ্রী হবে।' হারিন চুপ করে রইল।

মল্লিকা বলল, 'তুমি থাক ততক্ষণ, সিগারেট খাও।' পায়ের দিকে শাড়িটা একটু টেনে দিয়ে মল্লিকা চলে গেল ওদিকে।

একটু পর ফিরে এল ও হাসিহাসি মুখে।

'কি ব্যাপার?' মল্লিকার চোখের দিকে তাকায় হারিন। 'হাসছ খুব?'

'যা ভয় করছিলাম।' হারিনের সামনে এসে দাঁড়ায় মল্লিকা। 'হাঁস রেঁধে খাওয়াতে হবে।'

'কেন ওঁর স্ত্রী—' বলতে বলতে হারিন থেমে যায়।

'তুমিও যেমন!' গলায় অদ্ভুত শব্দ করল মল্লিকা। 'বৌ রেঁধে খাওয়াবে মাংস? তবেই হয়েছে। দেখছ না একটা বাচ্চা হবার পর কেমন এলিয়ে পড়েছে। হারিনের মুখের কাছে মুখ এনে মল্লিকা বলল, 'তা ছাড়া বুদ্ধিও কম। লাহিড়ী রাতদিন বলে, টায়ার্ড টায়ার্ড আমি ওকে নিয়ে, মিসেস রায়।'

হারিন চুপ করে চেয়ে লাহিড়ী-পত্নীকে দেখল। দূরে আর একটা গাছের ছায়ায় পা ছড়িয়ে বসে হাঁ করে আকাশ দেখছে। কুকুরটা শুয়ে আছে পাশে। আয়ার কোলে বাচ্চাটা ট্যাঁ ট্যাঁ করছে।

'আমি যাই।' মল্লিকা বলল, 'আমাদের স্পিরিটের বোতলটা নিতে এসেছিলাম।'

'ওরা স্পিরিট আনতে ভুলে গেছে বুঝি?'

'যা একখানা বৌ ওর।' মল্লিকা শব্দ করে হাসল। 'সব মনে করে আনলে তো হয়েছিলই।' চলে যেতে যেতে ও ঘুরে দাঁড়ায়। 'অথচ খুব রোমান্টিক মন লাহিড়ীর।'

'তাই নাকি।' হারিন ফ্যাল ফ্যাল তাকায়।

'শোন, কি কথা হল এখন।' মল্লিকা আর এক ঝলক হাসল। 'বললাম, আমার মনে ছিল না, মিস্টার লাহিড়ী, আজ গার্ডেনে আসবার ডেট্ দিয়েছিলেন আপনি।'

'বলেছিল বুঝি তোমায় আগে ?' হারিন প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ, বলতে বলল, তাতে কি, মন,—মনে রাখাটাই কি সব। এই যে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল দু'জনের এখানে এটাই বা কম লাভের কি।'

'বালিহাঁস শিকার করে এনেছে বুঝি ?'

'হ্যাঁ।' মল্লিকা মাথা নাড়ল। 'আমি চললাম।'

চুপ করে শুয়ে থেকে হারিন হাঁ করে তাকিয়ে রইল ওদিকে। বেতের মোড়ার ওপর বসে লাহিড়ী হাঁসের পাখা ছাড়াচ্ছে। উবু হয়ে বসে মল্লিকা রান্নার আয়োজন করছে।

বেশ কিছুক্ষণ পর, বেলা প্রায় কাত হয়ে এসেছে, মুখে রোদ লাগতে হারিন চোখ মেলল। মল্লিকা ফিরে এসেছে, হাতে হলুদের দাগ।

'শেষ হল ?' হারিন হাই তুলল।

'না গো না।' মল্লিকা বলল, 'একটা বাটি নিতে এলাম।'

'ওটা রাঁধবে না ?' আঙুল দিয়ে হারিন পায়ের কাছে শালপাতায় জড়ানো মাংস-পিণ্ড দেখায়। কয়েকটা মাছি এসে উড়ে বসেছে। 'ওটা খাব কখন ?' হারিন ঢোক গিলল।

'খাওয়া,—খাওয়াই কি সব।' যেন রুষ্ট হতে গিয়েও মল্লিকা হঠাৎ খুশী হয়ে উঠল। 'একটু বাসি হোক না,—হরিণের মাংস বাসি খেতে ভাল।' বলে ও বাটি হাতে করে চলে গেল ঝাউ-ছায়ার দিকে। হাঁসের মাংসের গন্ধ জেগেছে তখন।

শুকনো হেসে হারিন সিভিল সার্জনের কৌটো থেকে একটা সিগারেট তুলে মুখে গুঁজল। ওধারে আয়া থেকে আরম্ভ করে সব ঘুমে একাকার।

বধিরা

উত্তরা চলে গেছে। আজ তিন মাস পূর্ণ হল। আমার স্ত্রী উত্তরা দেবী। ইণ্টারমিডিয়েট পাশ, কলেজে পড়া ঝকঝকে মেয়ে। তিন মাস মিহির সেনের শিলচরের বাঙলোয় বিশ্রাম করছে শ্রীমতী। 'কেননা ভালোভাবে থাকতে না পারলে এত বড় শহর কলকাতায় মানুষের পরমায়ু কমে যায়, দুর্বল হয় ফুসফুস।' মিহিরের কথা। 'বৌদি দিব্যি ক'দিন কাটিয়ে আসতে পারতো বাইরে। ছিলুম তো আমরা শালবনি মাসের ওপর। সুলু ছিল কোনো অসুবিধা হত না।' মিহির আমার মুখের দিকে তাকিয়েছে। অর্থাৎ শালবনি সে একলা ছিল না। ওর সহোদরা সুলতা সঙ্গে ছিল। বৌদির সেখানে যাওয়া এবং দিন কতক কাটিয়ে আসা মোটেই খারাপ দেখাতো না।

সপ্রতিভ সুন্দর চোখে উত্তরা দাঁড়িয়ে থেকে মিহিরের চা খাওয়া দেখেছে, কথা শুনেছে নির্ভীক হয়ে। প্রথমবার ওই কথাই হয়ে রইল। মিহির ফিরে গেছে কর্মস্থলে।

হ্যাঁ, আমার বন্ধু আমার সতীর্থ আমার আবাল্য সঙ্গী মিহির। এক সাথে ছোট বেলায় ডাংগুটী খেলেছি, একসঙ্গে বড় হয়েছি। এখন সে বড়লোক। কালোবাজারে ঘুরে ঘুরে হাত ফর্সা করেছে, চেহারা করেছে সুন্দর। পাঁচ আঙুলে আংটি ছ' সেট সোনার বোতাম। মৌভাণ্ড থেকে যেবার এল সেবার হোটেলে না উঠে উঠল আমার এখানে। দরাজ গলায় ডাকল, 'বৌদি।'

সুন্দর করে উত্তরা জবাব দিল, 'ঠাকুরপো।'

শুনে গা জুড়িয়ে গেল। চুপ করে রইলাম।

দুপুরে এল তিন টাকা সেরের রুই মাছ আড়াই সের।

'এত মাছ কী হবে!' বলতে গেছি, উত্তরা ধমক দিয়েছে। 'দেড় ছটাক মাছ একদিন অন্তর ভাগাভাগি করে খেয়ে তোমার যদি মাছে অরুচি ধরে যায়, না খাবে।' অবশ্য বলেছিল উত্তরা হেসেই। শুনে মিহির ঠিক হাসেনি. উপভোগ করেছে।

তারপর সারা সকাল উত্তরার দস্তর মতো উত্তেজনার ভেতর দিয়ে কেটেছে। কালিয়া কোর্মা রান্না। ঠাকুরপোর সঙ্গে গল্প। মিহির রান্না-ঘরের চৌকাঠের ওপর বসে বৌদির সঙ্গে কথা বলেছে আর সিগারেট শেষ করেছে আধটিন।

'দু'টো পয়সা এই বেলা জমাবার চেষ্টা করো ঠাকুরপো, বিয়ে-থা করবে তো ঠিক।' সিগারেটের টুকরোগুলোর দিকে চেয়েই যেন উত্তরার বুকের ভিতর টনটন করছিল, সতর্ক করেছে ঠাকুরপোকে।

এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে সাদা দাঁত বার করে মিহির উত্তরার ঘামে ভেজা লাল টুকটুকে মুখের দিকে চেয়ে শুধু হেসেছে। আমি ছিলাম। আমি দাঁড়ানো ছিলাম কাছেই মিহিরের পাশে।

তারপর তিনজন এক সঙ্গে বসে খাওয়া, কথা, হাসি, গল্প। খাওয়ার পরে বিশ্রাম। এক ঘরে। আমার ঘরে আমার খাটের ওপর বসে। মিহির উত্তরা আমি। বিকেলে ভ্রমণ সিনেমা। বাড়ি ফেরার পথে শাড়ির দোকান। যে দামে উত্তরার শাড়ি কেনা হল সে দাম দোকানীর

হাতে তুলে দিতে মিহিরকে পর্যন্ত থমকে যেতে হয়েছিল। উত্তরা লক্ষ্য করেছে আমি লক্ষ্য করেছি। তারপর মিহির ভ্রূক্ষেপ করেনি। হাত বাড়িয়ে টাকা তুলে দিয়েছে। যেন মিহিরকে লক্ষ্য করার পর আমরা স্বামী-স্ত্রী পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করব আর সেই বিনিময়ের তিক্ততার অপরিমিত আনন্দ ভোগ করার নেশায় উন্মাদ হয়ে মিহির কেবল শাড়ি নয় দুল আংটি অনেক কিছু এক সন্ধ্যার মধ্যে কিনে উত্তরার হাতে জড়ো করতে লাগল। বাড়ি ফিরে এলাম এক সঙ্গে তিনজন।

হ্যাঁ, সঙ্গে আমি ছিলাম বরাবর। প্রথম থেকে শেষ, আরম্ভ থেকে সমাপ্তি, উৎসব থেকে আহুতি পর্যন্ত। পরের বার এসে মিহির বৌদিকে নিয়ে গেছে চেঞ্জে। মৌভাণ্ড থেকে গেছে মিহিজাম, শালবনি দেখা শেষ করে গেছে মধুবনি। স্থলু সঙ্গে আছে। ভয় কি। মিহিরের চিঠির চেয়েও উত্তরার চিঠির ভাষা ছিল রঙিন, রকমারী। মুগ্ধ হয়ে পড়তাম।

এখন ওরা শিলচর। স্থলু বেচারা সঙ্গে আছে কি? সুন্দর এক খামে করে উত্তরাদেবী চিঠি দিয়েছে মূল্যবান : শরীর আমার কোনোমতেই তেমন করে সারছে না কেন বল দিকিনি? তুমি এখন এক কাজ করো বরং। খামোকা বাড়িভাড়া না গুণে ওটা ছেড়ে দিয়ে মেসে-হোটেলে থাকতে পারো। তোমার ইচ্ছা। কেননা কারোর ব্যক্তিগত রুচি ও ভালোলাগার ওপর অন্যের ইচ্ছা জোর করে না চাপানোই ভালো। ভোলা আছে (আমাদের চাকর)? চলে যদি যায় যাক। একটা লোকের খোরাকীও কম কি এদিনে। তবু ক'টা টাকা বাঁচবে। জানো, এখন

আমি খুব ভালো মাংস রান্না করতে পারি। ঠাকুরপোর রোজ রাত্রে মাংস চাই। অদ্ভুত খেতেও পারে।

এত সব কথা আমার পরিচয়ের পিছনে। কিন্তু এ সব কথা তো রামানুজবাবুকে বলা যায় না। বললাম, 'আমি বিপত্নীক।'

'তাতে কি।' যেন হাত দিয়ে তিনি কথাটা উড়িয়ে দিলেন। হাসলেন। গম্ভীর ছিলেন একটু আগে। যেন ভাবছিলেন অন্য কথা। 'কথা যখন দিয়েছি ঘর আপনাকে দোবই।' রামানুজবাবু হাসিটা আরো বড় করলেন আরো সুন্দর। 'রামমোহন বিদ্যাসাগরের যুগ গেছে, দু'টো যুদ্ধ গেছে বুকের উপর দিয়ে। অত খুঁতখুঁতে মন নিয়ে মানুষ বাঁচে না এদিনে। কি বলেন?'

'সত্যি কথা।' ঈষৎ হেসে তাঁর মুখের দিকে তাকালাম। বৃদ্ধ হলে মানুষ কেবল সুন্দর হয় না স্নিগ্ধও হয় রামানুজবাবুকে দেখে তাই মনে হল। কোর্ট থেকে ফিরছেন বুঝি এই সবে। কাহিল ক্লান্ত চেহারা। আমায় বসতে বলে একটা ইজিচেয়ারে নিজেও বসে পড়লেন। খুলতে লাগলেন জুতো, জামা ছেড়ে রাখলেন ইজিচেয়ারের হাতলের উপর স্তূপ করে। হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার জিনিসপত্র কই?'

'এই তো!' বারান্দার এক প্রান্তে রাখা একটি সুটকেইশ ও বিছানার বাণ্ডিলটা দেখিয়ে দিলাম, আর একটা কুকার।

'স্বপাকে খাওয়া হয় বুঝি?' আমার জিনিসগুলির ওপর একবার চোখ বুলিয়ে তিনি ঘাড় তুললেন। কুঞ্চিত ভুরু প্রশান্ত করলেন। 'বৌ

মরে সন্ন্যেসী হয়ে গেছেন দেখছি।' বলে বৃদ্ধ হাসির কি দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ করলেন বুঝলাম না। হঠাৎ চুপ হয়ে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

দেখলাম স্তিমিত গৌরবর্ণ ভেঙ্গে আসা অবসন্ন শরীর। মাথায় টাক পড়েছে অনেকদিন আগেই মনে হল।

'আপনি ওপরের ঘরে থাকবেন।' আস্তে আস্তে বললেন তিনি। 'ওপর-নীচ ওঠানামা করা আমার কষ্ট হয়। এখানেই আছি।'

যেন তাঁর বাড়িতে আমার কাছে এই সুবিধাটুকুর জন্যে তিনি অনুরোধ জ্ঞাপন করছেন, কাতর অনুনয়।

সত্যি লজ্জিত হয়ে গেলাম বৃদ্ধের এই অত্যধিক বিনয়ে, নম্রতায়, এত ভদ্র মানুষ হয় আজকাল!

ছোট্ট ছিমছাম দোতলা-বাড়ি চুপচাপ। বাগান আছে উঠোনে। বাগান ঘিরে লাল মসৃণ বারান্দা। আমরা বসেছিলাম বারান্দার এপারে, ওপারে পিতলের ডাঁটওলা খাঁচা ঝুলছে পেঁপে গাছের ছায়া ঘেঁসে। সবুজ বড় একটা টিয়ে।

রামানুজবাবুর চোখ সেদিকে ফেরানো। আমিও তাকিয়েছিলাম একটুক্ষণ। উজ্জ্বল দৃপ্ত ঝক্‌ঝকে পালিশ একখানা হাত টিয়ের মুখে আধার তুলে দিচ্ছে। খাঁচার জন্যে হাত দুলছে কি হাতের ধাক্কায় খাঁচা কাঁপছে ঠিক বুঝতে পারলাম না। সুশ্রী কালো খোঁপায় বিকেলের সদ্য ফোটা টাট্‌কা সন্ধ্যামালতী গোঁজা। চওড়া পাড় কাপড়ের রক্তের মতো লাল। আস্তে আস্তে খাঁচা স্থির হয়ে গেল, হাত নামল। আধার ফুরিয়েছে

বোঝা গেল। দরজার নীল ভারি পর্দা সরিয়ে মেয়েটি পাশের ঘরে অদৃশ্য হল।

'আমার মেয়ে পদ্মিনী।' শান্ত শিশুর মতো রামানুজবাবুর সরল চাউনি। 'আর তো আমার কেউ নেই, বুড়ো ছেলে আর এই মা—দু'টিতে শূন্য পুরী আগলে আছি।'

'আপনিও বুঝি—' বলতে আরম্ভ করে চুপ করলাম, কেননা আমার আগেই তিনি সুরু করেছেন। 'যখন আমার স্ত্রী-বিয়োগ হয় তখন পদ্মিনীর বয়স ছিল সাত, এখন সাতাশ।' কড়ি কাঠের দিকে এক মুহূর্ত চেয়ে হিসাব করে বললেন, 'সাতান্ন—সাতান্নয় পা দিয়েছি খেয়াল করুন।'

'তা হবে।' আস্তে আস্তে বললাম।

'সন্ন্যেসী আমিও হতাম। পারিনি। পারলাম কই। পদ্মিনী ধরে রাখল।' দেয়ালের দিকে চেয়ে রামানুজবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

রামানুজবাবু আরো যেন কি বলতে চেয়েছিলেন। থেমে গেছেন। চেয়ারের এক হাত দূরে এসে ও দাঁড়িয়েছে। মনে হল এই পদ্মিনী। সাতাশের জোরালো শক্ত মসৃণ উদ্ধত ভঙ্গীর পায়ের কাছে রামানুজবাবুর জুতো-খোলা সাদা বিবর্ণ খেজুরের চামড়ার মতো শুকিয়ে আসা পা দু'টোকে কত অসহায় মনে হল।

'মুখ হাত ধোবে না, কাছারী থেকে ফিরেছ কখন—কফি খাবার কিছু খাবে না?' শাসন অভিমান যত্ন উৎকণ্ঠা বিরক্তি গলার স্বরে ঠিক কোনটা ছিল বুঝলাম না। দেখছি যেন টপ্‌টপ করে কথাগুলি ঝরে পড়ল রামানুজ-বাবুর মাথার ওপর। ঘাড়-হেঁট হয়ে আছেন তিনি। কোট শার্ট মোজা

পেণ্টলুন একে একে সরে গেল চেয়ারের হাতলের ওপর থেকে। ছোট টি-পয় এগিয়ে এল। তারপর এল কফির বাটি খাবারের প্লেট। আঙুল দিয়ে খাঁচাটা ইঙ্গিত করে রামানুজবাবু হাসলেন, 'দেখলুম তখন তুমি পাখিকে খাওয়াচ্ছ, তাই।' দোষ করেছেন, এখন স্খালন করছেন, এমন ভাব মুখের হয়েছে তাঁর।

'দেখলুম তুমি গল্পই করছ বসে। আমি পাখিকে খাওয়ান শেষ করে দিয়েছি।' বলে আর এক মিনিট দাঁড়ালো না মেয়ে। পাশের ঘরে চলে গেল। যাবার আগে বাঁ হাতে সুইচ টিপে দিয়ে গেল বারান্দার। সন্ধ্যা যে হল আমার যেন ঠিক তখন খেয়াল হল। সাদা আলোর নিচে রামানুজবাবুকে আরও কাহিল দেখাচ্ছে।

দেখলাম আমার ব্যবস্থাও আস্তে আস্তে হয়ে যাচ্ছে। চাকর এসে বাক্স বিছানা তুলে নিয়ে গেল। জিনিস রেখে ফিরে এসে নিতে এল আমায়। 'আসুন, আপনার ঘর খোলা আছে।'

চাকরটার হাতে একটা চাবি।

'ও, খোলা হয়েছে।' যেন আমিও যাবার জন্যে অস্থির। এমন ভাব করলাম। এমন ভাবই করতে হল আমার এ অবস্থায়। যেন এতক্ষণ বুড়ো মানুষের সরলতার বা ভদ্রতার সুযোগ নিয়ে এখানে দাঁড়ানোটা ঠিক হয়নি।

লক্ষ্য করলাম রামানুজবাবুও লজ্জিত। দুঃখিত। মাথা গুঁজে খুঁটে খুঁটে খাবার খাচ্ছেন কফি খাচ্ছেন।

আমি ঠিক ভাড়াটে না হলেও পঞ্চাশোত্তর এক বৃদ্ধের অনুগ্রহে ভাড়াটের মতো থাকতে এসেছি কথাটা ভুলতে বসেছিলাম।

বারান্দার পূর্বদিক অন্দরের। পশ্চিমদিকে দোতলার সিঁড়ি বাইরের মহলের সামিল। রামানুজবাবুর বৈঠকখানার দেয়াল ঘেঁসে সিঁড়ি বেয়ে আমি আমার ঘরে চলে এলাম চাকরের পিছন পিছন।

ঘর সুন্দর। বড় বড় দরজা জানালা।

একটা জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে নিচের দিকে তাকাতে চোখে পড়ল বারান্দার বাল্‌বের নিচে, খাচ্ছেন না, খাওয়া শেষ করে সেই চেয়ারটায় ঘাড় গুঁজে বসে আছেন রামানুজবাবু। তন্দ্রার কি পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন ধীরে ধীরে বোঝা গেল না। আর কেউ নেই।

রাত করে আর খাওয়া-দাওয়ার হাঙ্গামা এখানে করলাম না। চাকর বাইরের চৌবাচ্চার কলে যাবার বাথরুমের রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে গেছে। বিছানা পেতে আলো নিভিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম। ভাদ্রের শেষ আশ্বিনের আরম্ভ। ঘর অন্ধকার হতে সবুজ ফিন্‌ফিনে কুমারীর গায়ের মত কোমল এক ফালি জ্যোৎস্না এসে পড়েছে দেখলাম আমার জানালার পাশে। চুপ করে চেয়ে রইলাম। শিলচরে এখন কতো শীত ভাবি।

কিন্তু তার চেয়েও স্পষ্ট প্রখর হয়ে এক সময়ে আমার কানের কাছে ভেসে এল রামানুজবাবুর ঘরের দেয়াল-ঘড়ির টিকটিক শব্দ। স্তব্ধ রাত্রির বুক চিরে চিরে সময়ের নিঃসঙ্গ অভিযান। নিচে কোন জানালার ছিট্‌কিনি তোলার শব্দ হল একবার। টিয়েটা দু'বার ডেকে থেমে গেছে। ঘুঙুর বাঁধা কুকুর যেন একটা ঘুরছে কার পিছন পিছন। এ-ঘর ও-ঘর। কান পেতে রইলাম। পেয়ালা-পিরিচ সরিয়ে রাখার বাসন-কোসন তুলে রাখার

শব্দ। তারপরও জেগে রইলাম। তারপর আর কিছু শোনা গেল না। তারপর প্রতি মিনিটের চুপচাপের মধ্যে আগের শব্দগুলো'র রেশ ফিকে সন্ধ্যামালতীর গন্ধের মতো জেগে রইল কেবল।

পরদিন সকালে প্রাতভ্রমণ সেরে রামানুজবাবু, মোটা লাঠি হাতে টুপী মাথায় সন্তর্পণে আমার ঘরে এসে ঢুকলেন। বলে ফেললেন, কাল যা বলতে গিয়ে চুপ করেছিলেন।

পদ্মিনীর বিয়ে হয়েছিল। সাতক্ষীরার জমিদার বংশ নাকি ওটা। অঘোরবাবু অবশ্য এখানে কাজ করতেন, কোন সদাগরী অফিসের বড়বাবু ছিলেন। তাঁর ছেলে সন্দীপ। সুন্দর স্বাস্থ্যবান নিরহঙ্কার ছেলে। না, রামানুজবাবু যতদূর জানেন সন্দীপ চরিত্রবান, উদার, এ সম্পর্কে তাঁর অভিযোগ করার কিছু নেই। তবু কেন বিয়ের এক বছর পার না হতে চলে এল মেয়ে। মনের মিল হল না? রামানুজবাবু এর অর্থ খুঁজে পান না। আমার কানের কাছে মুখ এনে বললেন, 'পদ্মিনী যদি এখানে থাকতে চায় আমি জোর করে পাঠাব কেমন করে বলুন। আপনি বিপত্নীক। স্ত্রীর মৃত্যুর শোক অনুভব করছেন। আমি করেছি। আমি কোর্টে যাইনি তিন মাস পদ্মিনীর মা যখন মরল। তাই বলছি এ সবের অর্থ আমাদের কাছে নতুন দুর্বোধ্য ঠেকছে নাকি!'

চুপ করে আমি দেয়ালের মাকড়সার দিকে চেয়ে রইলাম।

আরো কি বলতেন, থেমে গেলেন।

'তোমার কোর্টের বেলা হল খেয়াল রাখ বাবা?'

রামানুজবাবু আস্তে আস্তে উঠে বিদায় হলেন। আমি নির্বাক স্থির

হয়ে বসে রইলাম কতক্ষণ। কেবল শব্দটাই শুনলাম, সিঁড়ি পর্যন্ত এসে আবার নীচে নেমে গেছে।

আমার পরিবেশ ছিল ছোট, চাওয়া ছিল অল্প। আর সেই চাওয়ার চাপ সইতে না পেরে ফাটল ধরেছে সম্পর্কে! ব্যাঙ্কের কেরানী আমি। আমার ঘরে সামান্য একটা রেডিও যখন উত্তরার চোখে পড়ল না, সিলিংএর দিকে তাকিয়ে পাখাহীন পাখার পয়েণ্টের ওপর চোখ রেখে উদাস শুকনো ঢোক গিলেছিল প্রথম দিনই, দেখে আমার অনুকম্পা হয়েছিল ওর ওপর আমার নিজের ওপর। রেডিও তুমি কিনলেও কিনতে পারতে, পাখা ঝোলানোটা খুব শক্ত নয় সংসারে। আর রেডিও আর পাখা সর্বস্ব নয় জীবনের, উত্তরাকে আমি বলতে পারতাম মুখ খুলে। বলিনি। বলতে গিয়ে কৌতূহল ভরা চোখে চুপ করে শুধু চেয়ে দেখেছি ওর কুঁকড়ে আসা গুটিয়ে আনা মনের পাখার অন্ধকার, অসহায় চেহারা। মা বৌকে বরণ করে-ছিলেন। 'সুলক্ষণা মেয়ে'—উত্তরার চিবুক স্পর্শ করতে গিয়ে আনন্দের আতিশয্যে তাঁর চোখে জল এসে গেছে পর্যন্ত লক্ষ্য করছিলাম। কিন্তু আমি জানি, সেদিন থেকেই জানতে সুরু করলাম আমার ঘরের দৈন্য সুলক্ষণা সুনজরে দেখছে না, দেখবে না। তাই হল।

কিন্তু এখানে গোলমাল কেন! রামানুজবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে আস্তে আস্তে একবার সেই জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াই। এতক্ষণে রামানুজবাবুর স্নানাহারও শেষ হয়ে গেছে, আমার খেয়াল নেই, বেলা অনেক হয়েছে। রামানুজবাবু আরাম কেদারায় বসে বিশ্রাম করছেন। অনেক যত্ন করে একজন তাঁকে পোষাক পরিয়ে দিচ্ছে। টাকপড়া মাথার পিছনের

চুলগুলোতে চিরুণি বুলিয়ে দিচ্ছে। টাই বেঁধে দিলে সুন্দর করে। পকেটে গুঁজে দিলে রুমাল। এবার রামানুজবাবু উঠলেন। বাইরে রাস্তায় গাড়ির হর্ণের শব্দ শুনলাম। তারপর সব চুপচাপ।

ফিরে এসেছে পদ্মিনী বাপকে গাড়িতে তুলে দিয়ে বোঝা গেল। দাঁড়ালো বারান্দায়। অহঙ্কারে উদ্ধত শির জোর করে নামানো, যেন জিদ করে। একবারও মাথা তুলে তাকায় না। নামছে বাগানে। পিতলের ঝাঁঝরি দিয়ে জল ঢালছে রজনীগন্ধার গোড়ায়। রজনীগন্ধার ডাঁটের মতো শক্ত ঋজু এক রোগা হাতে ঝাঁঝরির হাতল ধরা। আশ্বিনের রোদ ঝকঝক করছে। হলদে প্রজাপতি পাখা মেলে বসে আছে সূর্যমুখীর নধর পাতায়।

অবাক হলাম কালও বিকেলে যতক্ষণ ও দাঁড়িয়ে আমার সামনে রামানুজবাবুর সঙ্গে কথা বলছিল একবার মুখ তোলেনি। তাকিয়ে দেখার প্রয়োজন বোধ করেনি কে আগন্তুক। অহঙ্কার, ঈর্ষা না উপেক্ষা করার গতানুগতিক আনন্দ। অথচ আমি এ বাড়িতে থাকব। ঘর ভাড়া না দিলেও ঘরে থাকার অধিকার পেয়েছি নিশ্চয় শুনেছে। কেবল তাই নয়, আমি বিপত্নীক। শোকসন্তপ্ত। পত্নীপ্রাণ যুবক। অন্তত কৌতূহল হওয়াও তো ওর একবার উচিত ছিল।

নাকি লজ্জা। বিবাহোত্তর জীবন পিতৃগৃহে কাটানোর নিরতিশয় দুঃখ? যে লজ্জায় আমি আমার সত্য পরিচয় গোপন করলাম শিশুর মতো সরল একটি বৃদ্ধের কাছেও।

বাড়ি নিস্তব্ধ। দুপুর গড়িয়ে চলল।

কোনোমতে চারিটি রান্না করে তা-ই গলাধঃকরণ করে দ্বিতীয়বার যখন

জানালায় এসে দাঁড়ালাম, পদ্মিনী, হ্যাঁ, গলায় ঘুঙুর বাঁধা সাদায় কালোয় সুন্দর ছিম্‌ছাম একটি কুকুর বটে, কোলে নিয়ে গরম জল সাবান মাখাচ্ছে। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম। সাদা আঙুলের ফাঁক দিয়ে দুধের মতো ধব্‌ধবে সাবানের ফেনা গলে গলে পড়ছে পদ্মিনীর কোলে পায়ে। খোঁপা ভেঙ্গে মুখ থুবড়ে আছে পিঠের ওপর। না, আমার হাতের ধাক্কায় জানালার কবাটের বড রকম একটা শব্দ হয়েছিল পর্যন্ত। আশ্চর্য, একবার ঘাড় তুলল না, একটু নড়ল না। এতবড় শব্দ নিচে যায়নি মিথ্যা কথা। শিকল বাঁধা টিয়েটা ঘাড় উঁচিয়েছিল, কুকুরটা চকিত হয়ে আমার জানালার দিকে তাকিয়েছিল। তাকালে না শুধু একজন।

জানালা থেকে সরে এসে চৌকির ওপর চুপচাপ বসে রইলাম কতক্ষণ। ভাবলাম। নাকি ব্যর্থ জীবন অভিমানে জমাট বেঁধে গেছে। অনুভূতির অনুতমও আর অবশিষ্ট নেই।

তাই-ই বা হবে কেন শব্দ হবার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করেছি। যেন শব্দটাকে ইচ্ছে করে দূরে ঠেকিয়ে রাখার জন্যে ও কুকুরটার গলার সঙ্গে গাল ঠেকিয়ে চোখ বুজে আদরে আদরে আত্মহারা হয়ে গেছে।

আর আদরের সামগ্রীরও অভাব নেই দেখলাম। বেলা তখন তিনটে। আমি চা খেতে বাইরে যাব। নিচে নামছি। সিঁড়ির এক-পাশে দাঁড়িয়ে আছে পদ্মিনী। কোলে একটা খরগোস নরম কচি ঘাস খাওয়াচ্ছে হাতের মুঠোয় নিয়ে। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়েছিলাম। কিন্তু আমার দাঁড়ানো বা চলার শব্দ প্রতিপক্ষের একচুল মনোযোগ আকর্ষণ করল না।

স্থির অনড়। সমস্ত মন ঢেলে দিয়েছে খরগোস শাবকের কালো ধূসর গোল দু'টি চোখের ওপর, সবটা দৃষ্টি। পৃথিবীতে এত শক্ত এমন নিষ্ঠুর সংযত মানুষ আছে এই আমি প্রথম দেখলাম। ঈর্ষায় বিদ্বেষে আমার সর্বাঙ্গ পুড়ে গেছে। হন্ হন্ করে বেরিয়ে গেছি।

উত্তরার চাওয়া ছিল বাইরের, বস্তুর—যা সহজে বোঝা গেছে—দেখা গেছে। এমন কি এক এক সময় বড় বেশি স্থূল স্থির মনে হয়েছে। যেন এক জায়গায় গিয়ে ও থামবে। থেমেছে। ক' রাত বেচারার চোখে ঘুম ছিল না। ঠাকুরপোর নতুন বাড়ি তৈরী শেষ হোল। ঠাকুরপো গাড়ি কিনেছে। ও নিজে চেয়েছে দামী শাড়ি আর গয়না। পেয়েছে। আরো পাবে। আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে ওর। তৃপ্তির গাঢ় আলস্যে উত্তরা আজ বুঁদ্ হয়ে আছে।

কিন্তু এখানে কি? কিসের অতৃপ্তি? মনের মিল নেই। সন্দীপের মন যোগাতে পারল না? না সন্দীপ মন জাগাতে পারল না, পারেনি এই মেয়ের? জাগল না। এ কি প্রবালের মতো কঠিন, জ্যোৎস্নার রেখার মতো শূন্য?

অথচ সন্দীপের প্রশংসায় রামানুজবাবু মুখর হয়ে উঠেছেন। মেয়েকে জোর করে পাঠাবেন না। পদ্মিনী চলে এসেছে। রামানুজবাবু কি বলেন নি একথা? বলে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন।

আর সেই মন এখন ঝরে ঝরে পড়ছে পাখির খাঁচায়, কুকুরের যত্নে, খরগোস বাচ্চার খাওয়ানোয়, বুড়ো বাপের সেবায়।

এই দৃশ্য রামানুজবাবুর ভালো লাগবে। তিনি দেখছেন মেয়েকে।

আমি, আমার চোখে—না, উত্তরাকে আজ শিশিরের ফোঁটা মনে হয়। সূর্য উঠতে ও ঝলমল্ করে উঠেছে।

আর এ কি অরণ্যের অন্ধকার!

ভাষা দুর্বোধ, গভীর মন!

অহঙ্কার ও স্তব্ধতা দেখে কি তাই মনে হয় না!

আত্মাভিমানে অটল।

আমার তো তাই মনে হয়েছে। পদ্মিনীকে যদি একবারও সামনে আসতে না দেখতাম এসব মনে হত না। বলতে কি চায়ের দোকানে ঢুকেও আমার দুই কান ঝাঁঝাঁ করছিল। অর্থাৎ আমার উপস্থিতি তুমি স্বীকার করবে, আমি তোমাকে একবারও দেখব না। আমার দিকে যত খুশি তাকাও তুমি, আমি বরাবর অস্বীকার করে চলব। এই? তাই কি কাল এবং আজ দু'বার ঠিক আমার জানালা-বরাবর নিচে বারান্দায় কুকুর কোলে নিয়ে বসেছে? আমায় নিচে নামতে দেখে সিঁড়ির পাশে দাঁড়িয়েছে খরগোস নিয়ে? আশ্চর্য মানুষের মন। যত ভাল মানুষই সন্দীপ হোক না, এমন মনের সঙ্গে মনের মিল হওয়াই তো বিচিত্র। উত্তরা তোমার কাছে ছেলেমানুষ পদ্মিনী, মনে মনে বললাম।

ঠাণ্ডা চা গলায় ঢেলে ফিরে আসি নিজের ঘরে।

যা-ও টুকিটাকি দু' একটা জিনিস সঙ্গে এনেছিলাম ইতিমধ্যে বাক্স থেকে সেগুলো বার করে আমার সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা উচিত ছিল, কিন্তু কিছুই করা হল না। যেন কিছুই করবার নেই এ বাড়িতে। যেন এখানে আমি আর থাকছি না।

শুনছিলাম নিচে বাথরুমে জলের ছপ্‌ছপ্‌ শব্দ। রামানুজবাবু ফেরেননি তখন এবং এমন সুগন্ধ সাবান অনেককাল গায়ে মাখেন না তিনি একথাও সত্য।

তারপর তো দেখলামই। পুষ্পিত বসন্ত। খোঁপা বাঁধা, টিপ পরা, আলতা, কাজল, নোখে রং। কী নেই, কী ছিল না মেয়ের! জানালার একটা পাল্লা ভেজিয়ে দিয়ে চোরের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম। কোথায় মনোবেদনা। আগুনের শিখার মতো দশটি আঙুল ঘুরিয়ে শিস্‌ দিয়ে টিয়েকে নাচের তাল শেখাচ্ছে।

যত মনোবেদনা রামানুজবাবুর। পদ্মিনী চলেই যখন এল, তিনি তার সবটুকু সুখ দেখবেন, ওর অসুবিধা না হয় সেজন্যে বুড়ো বয়সে তিনি কাছারী করছেন। সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে সেদিন বৃদ্ধ আস্তে আস্তে আমার ঘরে এসে ঢুকলেন। তুললেন ফিসফিসিয়ে কথাগুলো। সন্দীপ গাইবান্ধায় হাকিম এখন। দেশজোড়া সুনাম। পদ্মিনীর একটু ত্রুটি থাকতেও পারে, সন্দীপের কি সেটা ভুলে থাকা উচিত ছিল না। না, রামানুজবাবু ছেলের নিন্দা করছেন না। যা সে করল ভালই করেছে, তার ভাল হোক। রামানুজবাবু দেয়ালের দিকে চোখ রেখে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'অথচ সন্দীপের বাপ অঘোরবাবু,—অঘোরবাবু পদ্মিনীর ফটো যখন চেয়ে পাঠালেন দেখে তিনি চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠেছিলেন। এই মেয়ে তাঁর চাই, এমন সুলক্ষণা মেয়েকে তিনি ছেলের বৌ করে ঘরে নেবেন। তখন সবে বিয়ের কথাবার্তা চলছিল।' দেখলাম রামানুজবাবুর চোখে জল এসে গেছে।

সুলক্ষণা। মেঝের একটা সরু ফাটলের দিকে আমি কতক্ষণ চেয়ে রইলাম। আমার মা সিদ্ধেশ্বরীর কথাটা মনে পড়ল।

রামানুজবাবু আরো বলতেন। রূপোর তীরের মতো সিঁড়ি বারান্দার অন্ধকার ভেদ করে আবার ভেসে এল সেই দৃপ্ত ধারালো কণ্ঠস্বর। 'তোমার খাবার তৈরী হয়েছে, নিচে এস বাবা।'

শান্ত শিশুর মতো রামানুজবাবু উঠে গেলেন। মনে মনে হাসলাম— মেয়ের সামান্য ত্রুটি থাকতে পারে। যেন কথাটা স্বীকার না করলে খুব ভাল দেখায় না। সন্দীপের ভুলে থাকা উচিত। বিপত্নীক রামানুজবাবু ঠাওর করতে পারছেন না কেন আজকাল এদের মনের মিল হবে না,—এর অর্থ কি? এই মনোবেদনা নিয়ে মেয়ের ত্রুটি সত্ত্বেও মায়ের মতো ওকে কাছে রেখে রামানুজবাবুকে জীবনের দিনগুলি কাটাতে হবে। তাই হবে, বললাম নিজের মনে। জোর করে তিনি পদ্মিনীকে কা'র কাছে পাঠাবেন? পত্নী-পরিত্যক্ত পুরুষের মন বুড়ো জানে না। আর রামানুজবাবু দেখেননি, যে জোর করেই চলে আসে, তার মনের জোর কতখানি। কত দৃপ্ত, কত নিষ্ঠুর, কত ভয়ঙ্কর।

শুয়ে শুয়ে শুনলাম ছিট্‌কিনি তোলার শব্দ। খরগোসকে ঘুমপাড়ানোর গুনগুন। হুক থেকে শিকলশুদ্ধ পাখিকে নামানো। জিমকে ধমকানো। পেয়ালা পিরিচ সরিয়ে রাখার ঝন্‌ঝন্ আওয়াজ। অনেক রাত্ত অবধি। এ-ও এক ধরনের বিলাস।

সংসার ছেড়ে এসে সংসার দেখা। যেখানে আমি স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্ত। দোষ-ত্রুটির সমালোচনা নেই। যা খুশি করব।

তবু উত্তরা হাই হিল পরে টেনিস খেলতে শিখেছে, ভাল মাংস রান্না করতে পারে।

মধ্যরাত্রে ঘুঙুর বাঁধা কুকুর নিয়ে এ-ঘর ও-ঘর করে বাপের সংসার তদারক করার অস্থির উন্মাদনায় নিজেকে দুর্বোধ দুরধিগম্য করে রাখে নি।

সোজা লাইনে উত্তরা চলে গেছে ভান করেনি।

পদ্মিনী কেন এমন করছে, রামানুজবাবু দূরে থাক, আমিই ঘেমে উঠেছি। অর্থ কি! কত দূরপ্রসারী ওর চাওয়া।

পরদিন আবার সেই দুপুরবেলা। জানি, পদ্মিনী আমার সঙ্গে কথা বলবে না, বলতে পারে না। কেবল ব্যারিস্টারের আদরিণী মেয়ে নয়; হাকিমের স্ত্রী। শুনলাম রামানুজবাবুর মুখে কাল।

এমনি ত অহঙ্কার আছেই।

তার ওপর উপেক্ষার আনন্দ অপমান করার অগাধ বিলাস। আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম পদ্মিনী আমার দিকে তাকাবেও না।

তবু, যেন শরতের রৌদ্র দেখে, টবে রক্তগোলাপের স্তবক দেখে সিঁড়ির মাঝখানে থমকে দাঁড়িয়েছি।

নির্লজ্জ। নির্বোধের মত আমি ডাকলাম, 'শুনছেন, শুনতে পাচ্ছেন?'

শুনল না, তাকাল না। খরগোসের পিঠে হাত বুলোতে লাগল।

আবার বললাম, 'আমার জল তোলা হয়নি, একটু জল খাওয়াবেন?'

আল্‌তো অন্যমনস্ক বাতাসের মতো ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে পাখির খাঁচার কাছে চলে গেছে ও ঘুরে।

ঘরে ফিরে এসেছি শূন্য নিঃসঙ্গ কোনোদিন মনে করিনি নিজেকে, এমন অকর্মণ্য। উত্তরা চলে যাবার পরও না।

সুটকেইশ বিছানা গুটিয়ে অলস অথব হয়ে বসে রইলাম বাকি দুপুর। রামানুজবাবুর অপেক্ষায়। তাঁকে বলে যাওয়া। কিন্তু আমার বলার আগেই তিনি বুঝলেন। কোর্ট থেকে বাড়ি ফিরে যখন দেখলেন আমার বাক্স-বিছানা বাঁধা হয়ে গেছে। যেন আমি কোথায় চলে যাচ্ছি। অবাক হননি রামানুজবাবু, হাসলেন।

'ভাল লাগবে না কোথাও. আমি জানি, আমারও এমন হয়েছিল। পদ্মিনীর মার মৃত্যুর পর পদ্মিনীকে সঙ্গে করে আমি কেবল এখান থেকে ওখানে গেছি কোথাও শান্তি পাইনি।'

চুপ করে রইলাম।

'মেসটেস একটা ঠিক করেছেন নাকি।' রামানুজবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

কিন্তু দেখলাম আমি কথা শেষ করার আগেই চাকর বাক্স-বিছানা তুলে নিয়েছে। নিচে নামছে। অর্থাৎ, আমি যাবই এমন কিছু প্রতিজ্ঞা যদিও আমার ছিল না, চলে যাওয়া উচিত কিনা ভাবছিলাম কেবল।

জিনিসগুলি রেখে এসে চাকরটা বললে, 'আসুন বাবু রিক্সা দাঁড়িয়ে।'

কা'র ইঙ্গিত, কিসের ইঙ্গিত বুঝতে কষ্ট হল না।

রামানুজবাবু ভাবলেন, বুঝি আমি রিক্সা ডেকে পাঠিয়েছি এবং অবুঝ সরল বৃদ্ধ নিচে পর্যন্ত এলেন আমায় তুলে দিতে। বললেন আমার হাত ধরে, 'না, সন্দীপ যা করেছে ভালই করেছে। আবার বিয়ে করেছে বলে

অঘোরবাবুর ছেলেকে আমি দোষ দিই না। শক্ত অসুখে ভুগে পদ্মিনী যদি কানে কম শোনে এটা কি ওর দোষ হল! তুমি শিক্ষিত তুমি—' কথা তাঁর শেষ হ'ল না। রাস্তার সবুজ গ্যাসের দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'লোকের কাছে বলি মনের মিল নেই, কি করব।' যেন নিজের মনে বললেন পরে।

কানে কম শোনে। আমি বিশ্বাস করতাম, করেছিলাম। ফার্ণ রোডের ঘনিয়ে আসা অন্ধকারের দিকে চেয়ে দুপুরে জল চাওয়ার সময় আমার কথাগুলি শুনতে না পাওয়া এবং ওর পাখির খাঁচার কাছে চলে যাওয়ার দৃশ্যটা মনে পড়ল।

আর এই শেষ মুহূর্তেও দেখলাম ওর শুনতে না চাওয়ার দৃপ্ত দৃঢ় অবিচল ইচ্ছা। কেননা, চাকর রামানুজবাবুকে বার বার এসে তাড়া দিচ্ছে। 'দিদিমণি ডাকছেন। আপনি ঘরে চলে আসুন বাবু হিম পড়ছে।'

রুক্ষ কর্কশ গলায় রিক্সাওয়ালাকে বললাম, 'চল্ দাঁড়িয়ে রইলি কেন।' উত্তরার সঙ্গে ওর এতটুকু মিল নেই, ভাবি।

ভোলাবাবুর ভুল

অনেকদিন পর আমরা পার্কে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম, কিন্তু বেড়ানো হল না।

পৃথিবীতে এত লোক থাকতে এই অমরেশের সঙ্গে কেন ভোলাবাবুর দেখা হল এসময়ে, ভেবে পেলাম না।

"না, ওখানে নয়। পার্কে বেড়ানো আমাদের অনেকদিন ফুরিয়েছে। রেস্টুরেন্টে আড্ডা দিস্ না ক'বছর?" ভোলাবাবুর হাতে ধরে অমরেশ একরকম টানতে লাগল, "মানুষ দেখলে ভয় পাই, জনতার চাপে নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হয় এখন। হয় না তোর?"

ভোলাবাবু নিরুত্তর। অমরেশ আমাদের নিয়ে এল পার্ক থেকে দূরে। সেটা পড়ো জমি। শেওলা ধরা ইটের স্তূপ। চারদিকে মাথার ওপর শিরীষ গাছ আছে অন্ধকার করে।

যেন ভোলাবাবু এখানে এসে স্বস্তিই পেলেন। আমি চুপ করে ওঁর পাশ ঘেঁষে বসলাম:

"কি বলছিলি? পরিবর্তন?" একটু চুপ থেকে অমরেশ আরম্ভ করল, "আমরা কেরানী, আমরা মধ্যবিত্ত, আমরা যাযাবর। আমরা—আমাদের সংজ্ঞা কেবল আমরাই।" বলে অমরেশ হো হো করে হেসে উঠল, "বুঝলে বন্ধু, পরিবর্তন তুমি বলছ, আমার দিকে তাকিয়ে দেখ, আমি কী হয়েছি!"

ভোলাবাবু তাকালেন কিনা দেখিনি। আমি তাকিয়েছিলাম। চোখ গর্তে গেছে, চোয়াল গেছে ভেঙ্গে। চুল দাড়ি বড় হয়ে কিম্ভূতকিমাকার চেহারা হয়েছে অমরেশের। ছেঁড়া পাঞ্জাবি গায়ে, পায়ে জুতোর বদলে খেলো সস্তা চটি। সেই অমরেশ।

"বৌ বার বার বলছিল আয় বাড়াও, এদের কষ্ট আমি দেখতে পারি না। রাত্রে দেয়ালে মাথা ঠুকে ও কাঁদে, ও বলছে—" অমরেশ হঠাৎ থামল।

"এমন!" ভোলাবাবু বন্ধুর মুখের দিকে তাকাল।

"এমন।" ঘাড় নেড়ে অমরেশ বলল, "আমার কয়টি ইস্যু জানিস? চারটি।" আঙুল তুলে দেখিয়ে বলল, "আমি চার সন্তানের বাপ হয়ে গেছি, ভোলানাথ। তুই তো সেদিন বিয়ে করেছিস। আমিও কি ঠিক সেদিন করিনি?" আকাশের দিকে চেয়ে অমরেশ যেন হিসাব করল কি।

"বুঝলি, শুধু বার্লির জল খেয়ে খেয়ে বাচ্চাগুলোর হাড় হয়েছে জেলির মতো জ্যালজেলে। দানা বাঁধল না। পাকা বাড়ি ছেড়ে আমরা চলে গেছি খোলার ঘরে। আমার স্ত্রীর হাতে একটা আংটি বলতেও আর গয়না নেই। আমি—" অমরেশ থামল।

ভোলাবাবু কি বলতে গেলেন, অমরেশ থামিয়ে দিল।

"বাহাত্তর টাকাকে ঘষে ঘষে আমি ক'বছরে নব্বুই করেছি। একশো করতে আমার চুল পেকে যাবে। আমার ছয়টি মুখ?" অনেক দুঃখে অমরেশ আবার হাসলো।

"কোনো উপায় নেই ?" ভোলাবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

হাসিটাকে আরো ধারালো করল অমরেশ। পাগলের মত মাথা ঝেঁকে উঠল।

"আমাদের নবকিশোরকে মনে পড়ে তোর ? নবীনকিশোর ?"

"ভাল ফুটবল খেলত, নাম করেছিল নবকিশোর।"

"উপায় খুঁজতে গিয়ে যক্ষ্মা হয়েছে ওর। উপায়।"

"কেন এমন হল ওর, কী করেছিল ও ?" ভোলাবাবুর গলা কাঁপছে, টের পেলাম আমি পরিষ্কার।

"কেরানী, বন্ধু। কেরানীর পরিবর্তন। বিয়ে করেছিল। কিন্তু আমার স্ত্রীর মতো তো আর দেয়ালে কপাল ঠুকতে যায়নি ওর স্ত্রী। একটু একালের মেয়ে। বিয়ের সতেরো দিন পরে বাড়ির অবস্থা দেখে তর্জনী তুলে শাসিয়েছিল নবকিশোরকে। তোমার মা আছে, বোন আছে বিয়ের বাকি। এই তোমার আয়। তুমি এমন ঝপ্ করে এখন বিয়ে করে আমায় এনে কষ্ট দেবার কে ?"

"তারপর ?" ভোলাবাবু ঢোক গিললেন।

"তারপর আর কি ? আয় বাড়াতে বেরিয়েছিল বেচারা। অফিসের মাপজোখ করা দড়ি তো আর কেউ টেনে লম্বা করতে পারে না। তাই উপায় বার করেছিল নবকিশোর অফিসের পরে আবার এক রাতজাগা অফিসে চাকরি নিয়ে।"

"যক্ষ্মা হ'ল শেষটায় ?"

"আমার হবে, তোমার হবে। কম খেয়ে বেশি খাটুনির নির্ঘাৎ পরিণতি

থার্ড ক্লাসের সরল হাইজিনে পড়োনি বন্ধু?" কথা শেষ করে অমরেশ পাগলের মতই হাসতে লাগল। এ ব্যাপারে এত হাসির কী থাকতে পারে আমি ভেবে পেলাম না। আর চুপ করে মাথা নিচু করে ভোলাবাবু ভাবছেন।

নাকি নিজের পরিবর্তনের কথাটা বাবু এখন বেশি করে ভাবছেন! পরিবর্তন তো আমার চোখের ওপর হয়েছে। বেশ তাড়াতাড়ি। আমি আগে এসেছিলাম এবাড়ি, তারপরের বছর তো এল উজ্জ্বলা। ভোলাবাবু যেদিন হগ্‌সাহেবের বাজার থেকে কিনে এনেছিলেন আমায়, সেদিন ট্যাক্সী করে বাড়ি ফিরেছিলেন। ফাউন্টেন পেন ছিল, সোনার বোতাম ছিল বাবুর জামায়। ঘড়ি, সিগারেট ভর্তি সুন্দর একটা টিনও।

উজ্জ্বলা এবাড়ি পা দিয়েই সুন্দর একটি কুকুর দেখে বুঝতে পারল কার কুকুর। উজ্জ্বলা আমায় ভালোবেসেছিল। আমায় ও চুমু খেতে গেছল একদিন। ভোলাবাবু বারণ করলেন কুকুরকে চুমু খেতে নেই। অবশ্য তা না করলেও উজ্জ্বলা আমায় কোলে নিয়ে সাবান-গরমজল দিয়ে যত্ন করে স্নান করিয়েছে, বাটি ভরে দুধ খাইয়েছে। ঠাণ্ডা না লাগে তাই একটু যেদিন ঠাণ্ডা পড়েছে, ফ্লানেলের টুকরো আমার পেটেপিঠে জড়িয়ে সেফ্‌টিপিন দিয়ে আটকে দিয়েছে। মনে হত, ভোলাবাবুকে উজ্জ্বলা এত ভালোবাসে বলে না আমি এত ভালোবাসা পাচ্ছি।

"পরিবর্তন আমার কবে থেকে আরম্ভ হয়েছে, জান অমরেশ?" শুনলাম ভোলাবাবু এতক্ষণে নিজের কথা বলছেন অমরেশের কাছে। "বড়দা যেদিন পৃথগন্ন হন। সেদিন থেকেই আমাদের হাওয়া বদলাচ্ছে, টের পেলাম।

দাদা তাঁর ছেলেমেয়ে বৌ নিয়ে মোটা আয় মনের মতো খরচ করবেন বলে উঠে গেলেন অন্য বাড়িতে। বাড়িটা যেন হঠাৎ ফাঁকা ঠেকল। শুনলাম উজ্জ্বলার বড় গলা। বাড়িতে ভাসুর ছিল বলে এতদিন গলা এমন চুপ ছিল। শুনলাম রান্নাঘরে ঝনঝন শব্দ করে থালাটা গ্লাসটা এখান থেকে ওখানে সরাচ্ছে ও। আঃ উঃ শব্দ করছে গরমে ধোঁয়ায়।"

তাই করেছিল উজ্জ্বলা। ভাসুরের আমলে ঠাকুরচাকর ছিল, রান্নাঘরে তো আগে ঢুকতে হয়নি কোনোদিন। কোনোদিন বাসন মাজতে হয়নি। বরং বিকেলে ভোলাবাবু যখন অফিস থেকে ফিরে এসেছেন দেখেছি দুজনে পিছনের বারান্দায় বসে আরাম করে গল্প করেছে, আমায় কোলে নিয়ে আদর করেছে। টব্ থেকে বেলফুল তুলে নিয়ে একজন আর একজনের জামার বোতামে গুঁজে দিয়েছে, আর জন দিয়েছে একজনের কালো চকচকে খোঁপায়। না, উজ্জ্বলার চুল যে এত সকালে এমন লালচে রং ধরবে আমার ধারণা ছিল না।

"ওর মুখ কালো দেখে প্রথমদিন আমার মন খারাপ হয়েছিল খুব বেশি", ভোলাবাবু বললেন, "তারপর আস্তে আস্তে গা-সওয়া হয়ে যায়। টানাটানির সংসারে মন ভার একটু থাকবেই। সরাসরি আমায় কিছু বলেনি উজ্জ্বলা। বিরক্ত ভাবটা, অথবা বলতে পারো ওর রাগ, অন্যভাবে প্রকাশ করেছে। আমার মা কেন বড়দার সঙ্গে গেল না। কেন এখানে আবার একটা আলাদা উনুন জ্বলছে। বুড়ির জন্যে বাড়তি খরচ। অথবা আমার জামা-কাপড়ের দিকে আর তাকানো যায় না। যেমন মোটা, তেমনি ময়লা। আমি হেসে ব্যাপারটা হাল্কা করতে চেয়েছি। বুড়ি মা

যদি আমাকে ছেড়ে যেতে না চায়, অথবা তোমাকে,—আমি কী করি বলো। ক'দিন আর বাঁচবে? বলেছি, এতকাল তো আদ্দি মলমল পরেছি আবার যখন দিন ফিরবে, হবে সব। শুনে উজ্জ্বলা কিছু বলেনি। বুঝলে অমরেশ, কিছুতেই আমি হাল্কা করতে পারিনি, উড়িয়ে দিতে পারিনি মেঘ।" ভোলাবাবুর গলা ধরে গেল। "আগে আমি যখন অফিস সেরে বাড়ি ফিরেছি, উজ্জ্বলা দরজায় দাঁড়িয়ে থাকত।"

"এ-তো বিরক্তির শৈশব অবস্থা ভোলানাথ, রাগের কৈশোর।" অমরেশ একটা চোখ ছোট ক'রে ভোলাবাবুর মুখের দিকে তাকাল। "আমাদের জগৎসুহৃদকে মনে পড়ে তোর?"

"জগৎসুহৃদ রুদ্র?"

"সেই যে কলেজের নামকরা পণ্ডিত ছেলে, চোখে ছিল জগৎ-জয়ের স্বপ্ন। মনে নেই?"

ভোলানাথ মাথা নাড়ল।

"কী হয়েছে ওর?"

"হবে আবার কি! কেরানী। কিন্তু পণ্ডিত, একালের মেয়ে তো বটেই, বিয়ে করেছিল বিদুষী। নবকিশোরের তো তবু সতেরোদিন গেছল, মিসেস রুদ্র শুভরাত্রিটা কোনোরকমে পার করেই রুদ্রাণী মূর্তি ধরেছিল। এই তোমার ইন্‌কাম! হরিবল্। আর যা-ই বল বাবা, স্ট্যাণ্ডার্ড আমি নামাতে পারবো না। ভদ্রভাবে থাকতে হবে তো! আমি চললাম।"

"কোথায় গেল?" চমকে উঠলেন ভোলাবাবু।

"কোথায় আবার! ইন্‌কাম বাড়াতে। কেন ড্যালৌসীর রাস্তায় মিসেস রুদ্রকে তুই একদিনও দেখিসনি? ব্যাগ হাতে। লাল টুক্‌টুকে ঠোঁট। ফাঁপানো চুল?"

"চাকরি করছে বুঝি?"

"হ্যাঁ, চাকরি করছে।"

"জগৎসুহৃদ?"

"ঘরে। পাঁচজনের পাঁচ রকম কথা শুনে বেচারার অফিস করা হল না। শুনছি, দুপুরবেলা বৌয়ের ময়লা শাড়ী পরে ঘরের কাজকর্ম করে। বিছানা রৌদ্রে দেয়। উড়ের চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দেয়।"

"জগৎসুহৃদের মৃত্যু হয়েছে।" ভোলাবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

"ঠিক মৃত্যু নয়—অপমৃত্যু। প্রতিনিয়ত অপঘাতে মরছে বলতে পারো। সেদিন নাকি বৌ ওর মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। চাকরের মতো চালচল্‌তি মিসেস রুদ্র পছন্দ করেন না। তাই রাগ।" কুটিল ক্রুর হাসি অমরেশের কুৎসিত চেহারায় ছড়িয়ে পড়েছে। বলল, "তোর বৌ দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে না, এই তোর দুঃখ!"

ভোলাবাবু চুপ করে রইলেন। সেদিনের একটা কথা মনে পড়ে আমারও মন কেমন করছিল। স্নান সেরে উজ্জ্বলা বাথরুম থেকে ফিরছিল বুঝি। দুপুরের গরম। বাথরুমের লাগোয়া বাগিচায় একটা ফড়িংয়ের পিছনে অনর্থক কতক্ষণ লাফালাফি করে আমি ঘেমে উঠেছিলাম। বারান্দার ছায়ায় উঠতে যাব এমন সময় উজ্জ্বলা সামনে পড়ে গেল। বিরক্ত হয়ে এমন অস্ফুট একটা শব্দ করল, যেন পরপুরুষ ওর সামনে পড়েছে।

তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে ও দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। উজ্জ্বলার গায়ে কাপড় নেই—আমি তো কতদিন দেখেছি। আসল কথা বাড়ির হাওয়ায় খুবই পরিবর্তন এসেছে। বাইরে ভোলাবাবুর জুতোর শব্দ হচ্ছিল। শনিবার অফিস সেরে একটার সময় বাড়ি ফিরছিলেন।

"কিন্তু মা বেশি দিন বাঁচে নি। দাদা পৃথক হওয়ার ছ'মাস পর মা মারা যায়। ভাবলাম এবার সংসারের বাড়তি খরচ বাঁচল। বুঝেছ অমরেশ। বিধি বাম। কাল অফিসে অর্ডার হয়ে গেছে। আমাদের পে-রিডাকশন হচ্ছে। অর্থাৎ এই মাইনেও থাকল না। এখন থেকে পঁচিশ বাদ দিয়ে বাকিটা নিতে হবে।"

"সুখবর।" অমরেশ আবার একটা চোখ ছোট করল। "শুনে কী বলছে ?"

বলবে কি, এই ব্যাপারে লোকটার হাসি রসিকতা আমার মোটেই ভাল লাগছিল না। আমাদের অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে শুনে ওর আনন্দ হচ্ছে নাকি ! আজ অফিস থেকে ফিরে এসে বাবুর চা-টুকু পর্যন্ত খাওয়া হয়নি। অমনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছেন। বেতন কমছে খবরটা বলার পর উজ্জ্বলা প্রথম শব্দ করেনি। চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়েছিল কাঠ হয়ে। ভোলাবাবু দেখেন নি, কিন্তু আমি লক্ষ্য করছিলাম উজ্জ্বলার মুখের ভাব। মাথায় ওর কাপড় ছিল না। বুড়ি মা মারা গেছে পর থেকে উজ্জ্বলা মাথায় কাপড় রাখত না। দেখাচ্ছিল ওকে ছোট একটি মেয়ের মত।

চৌকাঠে দাঁড়িয়ে উজ্জ্বলা চোখ তেরছা করে বাবুর দিকে একবার মাত্র

তাকিয়েছিল। তারপর মুখ ঘুরিয়ে দেয়ালের দিকে চেয়ে রয়েছে। ওর এমন করে তাকানোর অর্থ আমি বুঝলাম। অর্থাৎ ভাসুর ভিন্ন হয়ে যাওয়ার পর সংসারের পরিবর্তনটা ভাগ্যের পরিবর্তনের সামিল করে দেখেছিল উজ্জ্বলা। আজকের পরিবর্তনের মূলে দেখল সে সামনে মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকা পুরুষটিকে। পরে তো উজ্জ্বলা মুখেই বলল ভোলাবাবুকে।

"কী বলল তোর বৌ মাইনে কমছে শুনে?" অমরেশের দুই চোখ চক্‌চক করছে। যেন হা করে ওৎ পেতে আছে কথাগুলি শোনার জন্যে।

"বললে, লেখাপড়া শিখে তোমার হল কি। ভাসুরঠাকুর ম্যাট্রিক পাশ না করেও মাসে পাঁচ ছ'শ কামাচ্ছে। একটা বাসার চাকরের মাইনেও এর চেয়ে বেশি হয়। বড়দি নতুন আর এক সেট গয়না গড়াল সেদিন।" ভোলাবাবুর গলায় কান্নার স্বর ভেসে উঠেছিল। "দাদার ব্যবসা আর আমাদের চাকরি,—এ কথাটা আমি ওকে বোঝাতে পারলাম না, অমরেশ।"

"বোঝানো যায় না।" অমরেশ গলার একটা অদ্ভুত শব্দ করল। "তবু তো তোদের বৌ কথা বলতে পারে। আমার তিনি কাল আফিং খেয়েছিলেন, বুঝলি। রাতদিন কাঁদাকাটি আর দেয়ালে কপাল ঠোকা দেখে রাগ করে বলেছিলাম, ঘর-সংসার ছেড়ে আমি অন্য কোথাও চললাম এবং দু'দিন যাইও নি ঘরে। এর মধ্যে এই কাণ্ড। কিন্তু মরল না তো! আমার কুড়ি টাকা দণ্ড লাগল ডাক্তারে-ওষুধে। ধারের টাকা শোধ করতে ধার করতে বেরিয়েছি। কেমন শান্তিতে আছি, বোঝ বন্ধু।" নোংরা দাঁত বের করে অমরেশ হাসল।

লোকটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে ঠিক, মনে মনে বললাম।

উঠে যাবার সময় ভোলাবাবুর মুখের কাছে মুখ সরিয়ে এনে অমরেশ বলল, "হোক্ না দু' একটা বাচ্চা, আরো অনেক কিছু শুনতে হবে। এই তো সবে সুরু বন্ধু, অনেক কিছু দেখতে হবে।"

লোকটা চলে যেতে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। যেন দুষ্ট গ্রহের মতো ও এসে জুটেছিল।

শিরীষের মাথায় চিকচিকে রোদটুকু মিলিয়ে গেছে। ভোলাবাবু আস্তে আস্তে উঠলেন। আমিও গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

অবশ্য বাড়ি ফেরার পথে কোনো কুচিন্তা আমার মনে আসেনি। বড় জোর উজ্জ্বলা রাগ করে শুয়ে থাকবে। নয়তো গিয়ে দেখব, রাগের মাথায় কোমরে আঁচল জড়িয়ে রান্না করতেই বসে গেছে। আমাদের আওয়াজ পেলে গ্লাস বাটি ঝন্ ঝন্ করে এখান থেকে ওখানে ঠেলে দেবে। ওর ধাত জানা ছিল। আর বেচারার জন্যে যে কষ্ট না হচ্ছিল, এমন নয়। ওর ন' বছরের বড় বড়বাবুর স্ত্রী। তিন সন্তানের মা হয়েও নিত্য নতুন শাড়ি-গয়না পরে পান খেয়ে ঠোঁট লাল করে দিব্যি কচি খুকীর মতো হেসে খেলে বেড়াচ্ছেন। দেখে কি উজ্জ্বলার মন খারাপ হয় না! ভোলাবাবুও ঠিক একথাই ভাবছিলেন, আমার মনে হল।

বাড়ির উঠোনে পা দিয়ে আমরা থমকে দাঁড়ালাম। সত্যি তো কোনো ঘরে আলো জ্বলছে না। না রান্নাবান্নার শব্দ। কেমন একটু ভয় হল।

আমি আগে। বাবু পিছনে। বিপদের মুখে কুকুর চিরদিনই এগিয়ে যায়। যেন তখন আমি তাই করছিলাম। কিন্তু বারান্দায় উঠে ভুল ভাঙল।

দপ্ করে আলো জ্বলে উঠেছে। উজ্জ্বলা আলো জ্বেলে দিয়েছে আমাদের শব্দ পেয়ে।

আমরা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। দরজায় দাঁড়িয়ে উজ্জ্বলা মুচকে মুচকে হাসছে।

ভোলাবাবু খুশি হয়েছিলেন। অনেক দিন পর মেঘ কেটে গিয়ে রোদ উঠেছে দেখলে কার না মন ভালো লাগে! তাড়াতাড়ি তিনি উজ্জ্বলার সামনে গিয়ে দাঁড়ান। বাবুর কানের কাছে মুখ এনে উজ্জ্বলা ফিসফিসিয়ে কি বলল।

"সত্যি?" ভোলাবাবুর চোখ বড় হয়ে গেল। "সত্যি বলছ তুমি!"

মুখ সরিয়ে নিয়ে উজ্জ্বলা মাথা নাড়ল।

ভোলাবাবু বসে পড়লেন মাটিতে। তাঁর মুখের রং গেছে ফ্যাকাশে হয়ে।

"ভালো ডাক্তার তো জানা নেই আমার, উজ্জ্বলা,—এখন—"

দেয়ালের দিকে চেয়ে বাবু বলতে গেছেন বুঝি নিরুপায় হয়ে। ঠোঁট কাঁপছে তাঁর লক্ষ্য করলাম।

"কেন বল দিকিনি? এখনি কি?" উজ্জ্বলার হাসি তখনও নিভে যায় নি। "কী তোমার ইচ্ছা শুনি না? এখনি ডাক্তার কেন?"

ভোলাবাবু চুপ করে আছেন। ভাবছেন। যেন অমরেশের বেশভূষা, তার স্ত্রীর দেয়ালে মাথা ঠোকার কথা মনে পড়ে গেছে, মনে হল আমার।

"কী তুমি চাইছ, কী তোমার মতলব বল না।" উজ্জ্বলা কঠিন হয়ে উঠল।

"এই তো সংসারের অবস্থা আমাদের" বিষণ্ণ ভীরু গলায় ভোলাবাবু বলতে চেয়েছিলেন, "এখন থেকেই যদি সুরু হল— ।"

"ও, তাই।" নিস্পৃহ নিরুত্তেজ কণ্ঠস্বর উজ্জ্বলার: "কাপুরুষ, কাপুরুষ।"

উজ্জ্বলা চলে যেতে চেয়েছিল, ফিরে দাঁড়াল। "আমি তা হতে দেব না, না,—কোনো অধিকার নেই তোমার।" পরে বললে সে। দৃপ্ত কঠিন ভঙ্গী। "তুমি না পুরুষ!"

চমকে ভোলাবাবু উজ্জ্বলার মুখের দিকে তাকালেন। যেন থতমত খেয়ে গেছেন এমন মুখের ভাব, বললেন উজ্জ্বলার হাত ধরে: "পাগল, আমি তোমায় পরীক্ষা করছিলাম, অমরেশ বলছিল কিনা—"

আশ্চর্য, দেখলাম উজ্জ্বলা স্বাভাবিক হয়ে গেছে। হাসির রোদে ঝলমল করছে ওর সুন্দর চোখ। "থাক্ বাবু, এখন অমরেশ-টমরেশ। চট্ করে কাপড় ছেড়ে এসো তো, হাত মুখ ধোও।" বলে উজ্জ্বলা ঘরে চলে গেল।

কিন্তু বাবু তার পরও বারান্দায় আমায় কোলে নিয়ে বসে ছিলেন। যেন ভাবছিলেন কি।

আর আমি শুনছিলাম, উজ্জ্বলার আহ্লাদে গদগদ গলা ঘরের ভেতর। "টমিটা শুকিয়ে যাচ্ছে, দুধ তো দিতে পারি না। ভাতের ফ্যানই একটু বেশি করে দেব।"

আনন্দে আমার চোখ বেয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়ছিল। অনেক দিন পর আমার কথা মনে পড়েছে উজ্জ্বলার।

খেলোয়াড়

বালিগঞ্জের নতুন বাড়তি অঞ্চল।

তখনও বাড়ির ঠাসবুনোনি হয়নি ওখানটায়। পাথরের টুকরোর ওপর গরম পীচ ঢেলে ঢেলে সবে একটা রাস্তা তৈরী হচ্ছিল আর রাস্তার দু'পাশে চোরকাঁটায় ভরতি মাঠ, তালখেজুরের বাগান, বাসক কি কাঠমালতীর জঙ্গল অথবা বৃষ্টি হলে জল জমে এমন সব ঢালু পড়ো জমির বিস্তীর্ণ ব্যবধান রেখে ফ্যাশনেব্‌ল বাড়ি উঠছিল একটি দু'টি।

আমরা ও পাড়ার সব মিলিয়ে এক বয়সের পাঁচটি ছেলে একত্র হয়েছিলাম। একসঙ্গে থাকতাম অষ্টপ্রহর। একসঙ্গে ওঠা একসঙ্গে বসা একসঙ্গে গল্প করা। ইস্কুলে, ইস্কুল থেকে এসে, ছুটির দিন—হায় ছুটির দিন। কখন না? সেই পাঁচজন। পাড়ার এমাথা ওমাথায় তো সারা সময় টুঁ-টুঁ মেরেছিই, পাড়া ছেড়ে যখন অন্যত্র গেছি তখনও একজন আর একজনের কাছ-ছাড়া হইনি।

তের থেকে চৌদ্দ বয়স।

পরনে নীল ব্লেজারের প্যাণ্ট আর হাফ-শার্ট।

রুক্ষ চুল, জুতোহীন পা। আর সবচেয়ে প্রশংসনীয় যেটা, আঙুলে বড় বড় নোখ, হাঁটু অবধি ধুলো। বলতে কি, তৎকালীন বালিগঞ্জী সমাজের আমরাই ছিলাম প্রকৃত আতঙ্ক। বড়োদের বুড়োদের গিন্নীদের।

আর সবাই শান্ত হয়ে গিয়েছিল, সুশ্রী সংযত।

সবাই বলত আমাদের জংলী জানোয়ার অশিষ্ট। সেজন্যে বাড়িতে কারো ঠাঁই ছিল না। ঘরে ধুলো আনব, ড্রয়িং-রুম নোংরা করব, বাগানের ফুল ছিঁড়ব, ছাদের কার্ণিশ ভাঙব, অথবা সুবিধা পেলে কারো ছাদের জল-নামা পাইপের মুখেই হয়ত পাথর গুঁজে দেব। এই ছিল সকলের সন্দেহ ও ভয় আমাদের ওপর। পাড়ার পাঁচটি বখাটে কিশোর-রত্ন,—পিণ্টু, মিণ্টু, গুর্খা, হাবুল ও আমি।

কিন্তু বাড়ি থেকে বাতিল হয়েও পাঁচজনের মনে তিলমাত্র অসুখ ছিল না। শীতের সারা দুপুর হকি-স্টিক পিটিয়েছি, সারাটা বর্ষা মনের আনন্দে ফুটবল খেলেছি, মাঠের জলে ভিজে রোদে পুড়ে। ডাংগুটি খেলেছি, হাডু-ডু খেলেছি, কখনও বা ইঁট ছোড়াছুড়ি। এমনি। খেলার রকমও মাঝে মাঝে বদলাতো। কোনোদিন মাঠে জল জমলে বাজার থেকে কিনে-আনা এবং বাড়ি থেকে চুরি-করে-আনা পোনার বাচ্চা ছেড়ে দিতাম। আর, চেয়ে দেখতাম, কোন্‌টা মরে কোন্‌টা সাঁতার কাটে। পাখির বাচ্চা ধরেছি, গুল্‌তি ছুড়ে কাঠবিড়াল মেরেছি। আমাদের খেলার উপকরণ ও প্রকরণের অভাব ছিল না। নিত্য নতুন।

একটা কিছু নিয়ে সময় কাটানো। খেলার অর্থ। বরং নিত্য নতুন খেলা আবিষ্কার করতে পারলেই যেন সুখী হতাম।

একদিনের নতুন খেলার কথাই বলছি। পাঁচ কিশোর কাপ্তেন কি কাণ্ড বাধিয়েছিলাম।

মনে আছে। চৈত্রের বিকেল। পিণ্টুদের বাগানের ওপাশটায়

ছাতিম গাছের মাথা ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে। গন্ধে ম' ম' করছে পৃথিবী। মৃদু-মন্দ বাতাস ছিল। আর হাওয়ায় ছিল কোন্‌দিক থেকে উড়ে-আসা সদ্য-ফেটে-পড়া শাদা ঝকঝকে শিমুল তুলোর রাশ। যেন সিল্কের মেঘ উড়ছিল বাতাসে। তার সঙ্গে পাখির কিচিরমিচির, ভন্টুদের সুপুরি বাগান থেকে উঠে-আসা ঝিঁঝির ডাক।

যেন বিলিতি জাজ্‌ বাদ্য চলছিল বিকেলী বাতাসে। নতুন একটা কিছু খেলার জন্যে আমাদের বুকের ভিতর নাচানাচি করছিল।

পিং-পং ক্যারম লুডো তাস। বা এমনি একটা কিছু ফ্যানসী খেলা। ওয়ার্ড-মেকিং, বাগাটেলী, ফীগার-ড্রয়িং। যাতে ছোটাছুটি ও দস্যামী নেই। ভাবছিলাম। মাঠে জঙ্গলে থেকে তো আর এসব খেলা হয় না, সুতরাং আর কি রংদার মজাদার খেলা আছে যা বাইরে থেকেও খেলা চলে।

হঠাৎ নজরে পড়ল আগুনের মত দগদগে লাল ঝাঁকের পর ঝাঁক ফড়িং উড়ছে মাথার ওপর। শিমুল তুলোর মেঘ ঢাকা পড়ে গেল ফড়িং-এর পাখায়। এত ফড়িং একসঙ্গে আর দেখিনি।

আর, অমনি, ফড়িং ধরার নেশা চেপে বসল পাঁচজনের। আশ্চর্য, এখন ভাবি, কি অদ্ভুত সব খেলায় মেতে যেতাম, যেতে পারতাম তখন।

হ্যাঁ, ঠিক হল শুধু ধরা নয়, বাজি রেখে ফড়িং ধরা হবে, তারপর সেগুলি মারা হবে। কে কত বেশি ফড়িং মারতে পারে তার প্রতিযোগিতা। বুঝুন মজা।

আইডিয়াটা প্রথম এসেছিল গুর্খার মাথায়। রাজী হয়ে গেলাম সব। অবশ্য তখনই জানতাম সবচেয়ে বেশি শিকার করবে গুর্খা।

হ্যাঁ, ও ছিল আমাদের সর্দার।

গুর্খার কথায় তখন আমরা উঠি বসি।

মোটে একবছরের বড় হয়েও ও গায়ে জোর রাখত চারজনের চেয়ে অনেক বেশি। আর ঢেঙা হয়ে উঠেছিল অসম্ভব। এ-ই লম্বা ছিল হাত পা। বৃষ্টি হলে প্রায়ই আমরা লেংটা হয়ে মাঠের জলে নামতাম। আর গুর্খার শরীরটাকে তখন মনে হত রঁাদা করা তালের গুঁড়ি। ওই বয়সে।

বলত ও, মামাবাবুর কাছে রিং করে। আর একদিন বলেছিল ফি শীতে ও এক ডজন করে কড্‌লিভার অয়েল চালাচ্ছে। কোন্‌টা সত্য তা অবশ্য আজও আমরা জানি না। তবে ওর চিক্‌চিকে কালো রং, ঝক্‌ঝকে দাঁত আর লম্বা শরীর আমাদের মুগ্ধ করেছিল।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম, ফড়িং ধরার বাজি সুরু হল। দেখতে দেখতে গুর্খা একলা এক হাতে প্রায় সব ফড়িং সাবাড় করে এনেছে। কেউ কাছে ঘেঁসতে পারছি না; কনুই দিয়ে গুঁতো মেরে মেরে ও আমাদের সরিয়ে দিচ্ছে আর ছোঁ মেরে সকলের মাথার ওপরের শিকার কেড়ে নিচ্ছে। এক দমে গুর্খা ধরল একশো একান্নটা, আর আমরা কেউ ত্রিশ কেউ বত্রিশ।

এমন সময় দেখি গুর্খার মাথার ওপর থেকে ছোঁ মেরে একসঙ্গে পাঁচটা ফড়িং নিয়ে গেল একখানা হাত। ফর্সা হাতটাকে সোনালী বর্শার মত মনে হলেও মূর্তি দেখে আমাদের মেজাজ টং।

কতক্ষণ চোখ ফেরাতে পারিনি।

ঘাড়ের নিচেটা ছেলেদের মাথার মতন চাঁছা, আবার চুলে এত বড় একটা গোলাপী রিবন। গায়ে আঁট গেঞ্জি অথচ উরুর কাছে লাল শাটিনের

কুঁচি হিল্‌হিল করছে। পায়ে মোজা এবং ছেলেদের জুতোর মতন মোটা মাথাওলা ফ্ল্যাট্‌ স্যু।

কি বলব, কি বলার ছিল।

এত বড় মেয়েকে ওই পোষাকে ছেলেদের সামনে আসতে, কেবল আসা নয়, থাবা মেরে ছেলেদের শিকার কেড়ে নিতে আর কোনোদিন দেখিনি।

গরম হয়ে গিয়েছিল বেশি গুর্খা। চেহারা দেখেই অনুমান করলাম। ভয় হচ্ছিল, গোঁয়ার ব'লে। ওর এমনি একটু বদনাম আছে। ধাঁ ক'রে না চড়টড় বসিয়ে দেয়। তা অবশ্য আর হল না। আমাদের বয়সের মেয়ে বলেই যেন প্রথমটায় ও চুপ করে রইল, দাঁতে দাঁত চেপে। বুঝলাম, প্রাথমিক রাগটা গুর্খা কোনোমতে দমন করল।

মেয়ের পা থেকে মাথা দু'বার চোখ বুলিয়ে সে আমাদের দিকে তাকাল, অর্থাৎ কিংকর্তব্য।

আমাদের বলবার কিছু ছিল না।

আমরা সাকরেদ। যা করার তুমিই কর। তোমার হাতে ছেড়ে দিলাম মামলা। যেন এই মনের ভাব নিয়ে চারজন চুপ করে মেয়েটাকে ভালো করে দেখা শেষ করার পর ফের গুর্খাকে দেখলাম। আমরা পরতুম নীল ব্লেজারের প্যাণ্টের ওপর সাদা হাফ্‌-শার্ট আর ওর ছিল সাদা প্যাণ্ট, —না শার্ট নয়, লাল ও বেগুনী রঙে মেশানো জাফ্‌রি-কাটা টেনিস-গেঞ্জি। ওর মামাবাবু দিয়েছিল।

হঠাৎ শুনলাম গুর্খা প্রশ্ন করছে, 'তোমার নাম কি ?'

'মোনা।' চক্‌চকে চোখে মেয়ে গুর্খাকে নিরীক্ষণ করছে।

তারপরই শুনলাম গুর্খার মিলিটারী নিনাদ। 'তুমি সরে যাও। ছেলেদের খেলায় কোনো মেয়ের আসা আমরা পছন্দ করি না।'

বলে গুর্খা আমাদের মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

চারজন সমর্থনসূচক মাথা নাড়লাম।

বস্তুত কোনো মেয়েকে নিয়ে আমরা এর আগে খেলিওনি। ক'টা বা বাড়ি। ঐ বয়সের কোনো মেয়ে আছে বলে জানতুম না। এবং গুর্খার চাউনি ও হুঙ্কারে শ্রীমতীর চেহারায় কোনো ভয়ডরের চিহ্নও দেখলাম না। বরং যেন একটু বেশি টান হয়ে দাঁড়ালো গুর্খার সামনে। বাঁ হাতের একটা সুস্পষ্ট আঙুলে ফ্রকের কুঁচিটা নাড়াচাড়া করছিল।

'আমাদের বাড়ির সামনের ফড়িং আমিই ধরবই।' যেন বিনা কায়-ক্লেশে, দিব্যি চোখ বুজে, রূপালী ঝিনুকের মত থুঁতনিটা আকাশের দিকে তুলে ধ'রে মোনা-নাম্নী মহিলা বলল, 'তাতে তোমাদের কি।'

মহিলা শব্দটা প্রয়োগ করলাম আমাদের বয়সী মেয়ে বলে। অন্তত আমরা ওকে সেই চোখেই দেখতাম। চার সাকরেদ।

কিন্তু গুর্খা ঠিক গরম হয়ে গেছে। স্বেচ্ছা কথা সে কোনোদিনই বরদাস্ত করত না।

'বেশ, গায়ে জোর থাকে নিয়ে যাও।' গুর্খা হেঁকে উঠল। একবার আমাদের দিকেও তাকাল।

'এসো না।' বেশ চিবুক নেড়েই মোনা ডাকল সর্দারকে। গা কাঁটা দিয়ে উঠল।

লাল তিনটে ফড়িং ফর্‌র্‌ শব্দ করে তু'জনের মাথার ওপরে উড়ছিল।

অল্প অল্প বাতাসে মেয়েলী চুলের গন্ধ এসে ঢুকছিল নাকে। আমরা চুপ করে দেখছিলাম।

তবে এটা ঠিক, অই বয়সে গুর্খাব উরু তু'টো যদি ছিল রাঁদা করা তালের গুঁড়ির মত সুডোল শক্ত, অই বয়সের মেয়ের উরু তু'টোও কম যাচ্ছিল কি। যেন দেখছিলাম সোনালী তু'টো থাম। অল্প সরু হয়ে নিচের দিকে নেমে এসেছে।

এখানেও মাংসের ঠাসবুনোনি। তবে মসৃণতা বেশি। বেশি ঝকঝকে। সোনালী থামের মাথায় লাল ফ্রকের কুঁচিটা সাপের গায়ের মতন কিল্‌বিল্‌ করছিল। হিল্‌হিল্‌ করছিল গুর্খার ভাষায়, কেননা পরবর্তী জীবনেও যখন ও মোনার গল্প করত তখন ঐ শব্দটাই ব্যবহার করত বারবার।

এবং মেয়ের শরীর দেখে আমাদের মনে হয়েছিল যেন রিং-করা কি কড্‌লিভার-খাওয়া তেজী শরীর। টন্‌কো। মাজাঘষা। তা হলেও সমান বয়সী ছেলেদের বিক্রমই গুর্খা সহ্য করেনি, আর এ তো মেয়ে।

এর পর গুর্খা কি বলে নিশ্বাস বন্ধ করে শুনবার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।

'বেশ, বাজি রেখেই ফড়িং ধরা হোক। কার গায়ে কত জোর আছে দেখা যাবে।' বলল গুর্খা।

'আমি রাজী।' মেয়ে উত্তর করল।

'জুতো মোজা খুলে ফেল, আর ওটা।' নিচের পাতলা শাটিনের দিকে চোখ ছিল গুর্খার।

মেয়েটা একটু হাসল ও কথায়। 'পুরুষের সামনে আমি খালি-গা হব নাকি।'

গায়ের জামা না খুলে ও জুতো মোজা খুলল। আমাদের রাগও হচ্ছিল হাসিও পাচ্ছিল। অথচ পুরুষের সঙ্গে লড়বার শখ, যেন মনে-মনে বললাম চারজন।

গুর্খা বকের মত গম্ভীর। বুঝলাম ও শুধু অপেক্ষা করছিল কখন খেলা সুরু হয়। একটা চাপা নিশ্বাস ফেলতে শুনলাম ওকে।

আরম্ভ হল লাফালাফি।

প্রথমবার গুর্খা ধরল পাঁচটা ফড়িং, মোনা পাঁচটা। সমান সমান। মোনা হাসল, গুর্খা গম্ভীর।

চোরকাঁটার বিছানায় আধমরা ফড়িংগুলো ছুড়ে ফেলে দিয়ে দু'জন আবার তৈরী হল।

কুরচি ফুলের গন্ধ, চুলের গন্ধ, ঝিঁঝির ডাক এবং পাখির অশ্রান্ত কিচিরমিচির সত্ত্বেও আমাদের বুকের ভিতর বেশ ঢিবঢিব করছিল। পশ্চিম আকাশে একখণ্ড লাল মেঘ।

কেননা আমরা জানতাম গুর্খাকে, ওর স্বভাব।

হলও তাই।

ছুটে গিয়ে হাত বাড়িয়ে মোনা গুর্খার মাথার কাছাকাছি একটা শিকার ধরতে গিয়েছিল। গুর্খা মারল মেয়ের পাঁজরে কনুইয়ের গুঁতো।

মেয়ে মারল ওর মাথায় চাঁটি। গুর্খা সাপ্টে ধরল ওর চুল। মোনা টেনে ধরল টেনিস-গেঞ্জীর কলার। আকাশের ফড়িং আকাশে রেখে জাপ্টাজাপ্টি করে দু'জন পড়ে গেল মাটিতে।

আমরা চারজন নিষ্পলক নিস্পন্দ।

বাধা দিইনি। কেননা কারো বাধা গুর্খা তখন শুনত না। উচিত ছিল মোনার ছেড়ে দেওয়া। শত হলেও তুমি মেয়ে।

কিন্তু নিমিষের মধ্যে চোখ চড়কগাছ হয়ে গেল আমাদের সকলের। গুর্খা নিচে পড়ে গেছে।

ভাবতে পারিনি, যেন চোখকে বিশ্বাস করা কঠিন হল। উজ্জ্বল সোনার রঙের উরু দিয়ে চেপে ধরেছে মেয়ে গুর্খার মিশ্‌মিশে কালো শরীর। যেন কুঁকড়ে যাচ্ছে গুর্খা।

ভয়ের মাত্রা আমাদের বেড়ে গেল তখন। বেকায়দায় পড়লে গুর্খা কি সাংঘাতিক হয়ে ওঠে, ভালো করে মনে পড়ল। ওর বাঘা নখের আঁচড় ও রাক্ষুসে দাঁতের কামড় খেয়েই চার সাঙাত বড় হয়ে উঠছিলাম।

জোরে চিৎকার করে মোনা দূরে ছিটকে পড়ল আর ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে গুর্খা কুকুরের মত ধুঁকতে লাগল। জ্বলন্ত দৃষ্টি।

মোনার উরুর পুরু মাংসে জোরে নখ বসিয়ে দিয়েছে সে। দিয়ে দেখছে।

মেয়ের চিৎকার শুনে পাশের একটা নতুন হলদে বাড়ির ভিতর থেকে যিনি ছুটে বেরিয়ে এলেন, বুঝলাম, মোনার মা। তাঁর উঁচু ফর্সা সুন্দর শরীরই আমাদের বলে দিল।

হ্যাঁ, ভালো কথা, সেদিন খেলতে খেলতে কি করে যে নতুন বাড়িটার কাছাকাছি এসে গেছলাম খেয়াল ছিল না। তখন খেয়াল হল। আর নতুন করে ভয় ঢুকল চারজন কেন, পাঁচজনের মনেই। গুর্খার চেহারায়ও একটু ভয় ঝুলছিল।

আ! কে বিশ্বাস করে আজ আমাদের কথায়।

সত্যি ভালো ছিলেন মহিলা। অত্যন্ত ভদ্র ও শান্ত।

আমরা আশাই করতে পারিনি, মেয়ের অবস্থা দেখে রাগ না করে তিনি হাসবেন। সত্যি সুন্দর করে হেসে মহিলা বললেন, —'কি হয়েছে?' মেয়েকে প্রশ্ন করার পর তিনি আমাদের দিকে তাকালেন।

'তোমরা এই পাড়ার ছেলে?'

আমরা ঘাড় নাড়লাম।

'তোমার নাম কি?'

সকলের আগে সর্দারের দিকে চোখ পড়েছিল মহিলার।

চোখ তুলে নরম গলায় গুর্খা বলল. 'গুর্খা।'

'চমৎকার নাম।' মোনার মা মুখ ফিরিয়ে মেয়েকে বলল, 'নাও, ওঠ, আর কাঁদে না। খেলতে গেলে এমন এক আধটু লাগেই।' মোনা মাটিতে বসে একটু একটু কাঁদছিল।

'হ্যাঁ, খেলোয়াড়ের মন নিয়ে খেলতে হয়।' বললে গুর্খা। রীতিমত হাসিহাসি মুখ হয়ে গেছে তার তখন। আমরা চুপ। গুর্খা সাহসী ছিল বলতে হয়।

'রিং-করা শরীর ?' ফের প্রশ্ন করেন মহিলা।

বড় বড় দাঁতে হেসে গুর্খা মাথা নাড়ে।

'আর ওকে রিং ডাম্বেল ত্ব'টো করিয়েও তেমন শরীর তৈরী করতে পারলাম না', মেয়ের দিকে চেয়ে মা বিষন্ন নিশ্বাস ফেললেন।

আমরা চুপ। মোনা ইতিমধ্যে উঠে দাড়িয়েছে। যেন কি ভেবে মুখ নিচু করে গুর্খা টিপিটিপি হাসছে।

হ্যাঁ, চৈত্রের সেই মাজাঘষা বিকেল, মৃতুমন্দ হাওয়া ছাড়ছে, রোদের হলুদ রং মজে গিয়ে কমলা রং ধরেছে, শিমুল তুলোর রাশ আর রক্তবর্ণ ফড়িঙের শবশয্যা ছেড়ে আমরা খেলোয়াড়ের দল চলে আসতুম। তিনি আটকালেন। 'এসো, চা খেয়ে যাও।'

শুনে খুশিতে সব বোকা হয়ে গিয়েছিলাম। আমাদের মত ডানপিটে মাথাভাঙা বাউণ্ডুলে ছেলেদের সেদিন এক মহিলা তাঁর বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ করছেন, যেন বিশ্বাস করাই কঠিন ছিল। সত্যি কতকাল আমরা কারো বাড়ির অন্তঃপুর দেখিনি।

গুর্খার হাতে ধরে মহিলা আগে আগে হাঁটেন, পাশে মোনা। আমরা চার সাকরেদ পিছনে।

বলতে কি, মেয়ের শরীরের তুলনায় মার শরীর যে কত বেশি সুন্দর উজ্জ্বল সুপরিস্ফুট, পিছন থেকে চারজন মনে মনে তাই আবার আলোচনা করলাম। শ্বেতপাথরের মতো সাদা ধবধবে রং। ঘাড় বেয়ে পা অবধি ঝুলছিল মনোরম ভায়লেট ক্রেপ্। ময়ূরপেখম রঙের ব্লাউস গায়ে। অগাধ বিস্তৃত বেণী। ওখানে রিবন এখানে ফুল।

মেয়ের চেয়ে অনেক বলশালিনী তো নিশ্চয়ই, দীপ্তিশালিনীও মা। আমরা মনে মনে স্বীকার করলাম।

আর তিনি, হাঁটতে হাঁটতে শুনলাম, আবার প্রশংসা করছিলেন গুর্খার শরীরের। এই বয়সে ওর কব্জি কেমন পুরু হয়েছে, কত চওড়া হয়েছে বুক। যেন মেয়েকে বোঝাচ্ছিলেন। 'সমান বয়সের একটি ছেলে ও একটি মেয়ের শরীরের অইখানেই তফাৎ।' মেয়ে মাথা তুলছিল না।

বাড়িতে ঢুকবার পর, মার প্রস্তাব শুনে কিন্তু আমরা ঘাবড়ে গেলাম। অবশ্য দেখলাম, গুর্খা অবিচল অকুতোভয়। মহিলা হাসতে হাসতে কথাটা তুললেন।

'ওখানে বাজি রেখে মোনা আর তুমি ফড়িং ধরেছিলে। এসো, এখানে আমি আর তুমি বাজি রেখে প্রজাপতি ধরি। রাজী?'

গুর্খা হেসে দিব্যি ঘাড় নাড়ল।

আমাদের বুকের ভিতর ঢিবঢিব করে উঠল।

মহিলা খেলাচ্ছলেই বলছিলেন যদিও।

তাঁর বাগানে জাফ্‌রির গায়ে ফুলের চেয়েও প্রজাপতির সংখ্যা ছিল বেশি। ডিমের মতো গোল আইভি পাতার ওপর চুপচাপ বসেছিল হাতের তেলোর মতো বড়, ছড়ানো, দীর্ঘপক্ষ হলুদ রঙের রাশি রাশি প্রজাপতি। চোখ জুড়িয়ে গেল।

আর এদিকে চক্ষুস্থির, গুর্খার কাণ্ড দেখে।

মোনার মা শাড়ির ঝুলন্ত আঁচল কোমরে নামান। বেণী দুটোকে

ইংরেজী আর্টের মতন করে তুলে দেন মাথার ওপর। ইয়ারিং-সহ কান দু'টোকে শ্বেতপাথরের পাপড়ির মত দেখাচ্ছিল। কি আলাদা দু'টো প্রজাপতি। শ্বেতপাথরের গাছের গায়ে যেন লেগে আছে।

খুব ছোট দেখাচ্ছিল গুর্খাকে মোনার মার সামনে। তার ওপরে ওর রং বেজায় কালো। মনে হচ্ছিল ওকে বন্দুকের কুঁদো, ছুরির বাঁট, কি বুরুশের হাতল একটা। শক্ত কুঁদে কাঠের জিনিস। দাঁড়িয়ে আছে সুন্দর বিস্ফারিত শরীরের সামনে।

তার ওপর হাঁটু অবধি ধুলো লেগে ছিল গুর্খার। নোংরা বেশভূষা খাড়াখাড়া চুল।

আমাদের কেমন লজ্জা করছিল, সঙ্কোচ। কিন্তু গুর্খার তো আর সেসব বালাই ছিল না। বড় বড় দাঁত পুরো চামড়ার মধ্যে ঢুকিয়ে হাসি বন্ধ করে গম্ভীর গলায় বলল, 'ওটা খুলে ফেলুন।'

অর্থাৎ মহিলার ময়ূরপেখম রঙের জামাটি।

হাসতে হাসতে তিনি তা-ও খুললেন।

সাদা বডিজে-ঘেরা খোলা গা সোনার হারে চিক্‌চিক করছিল।

'নিয়মকানুনগুলো তুমি এর মধ্যেই শিখে ফেলেছ ?' মা একবার মেয়ের দিকে এবং পরে আমাদের দিকে চেয়ে হাসলেন।

গুর্খা গম্ভীর। মহিলা তাই চুপ করে গেলেন।

'রেডি।' গুর্খা জোর গলায় হাঁকল।

এখনই লাফ সুরু হবে। সত্যিকারের একটা বাজির আবহাওয়া থমথম করছিল যেন। না, বাগানের ফুল ছেঁড়া বা বেড়া ভাঙা নয়, আমাদের বুক

কাঁপছিল গুর্খার চরিত্রের কথা ভেবে। সত্যি না ও আবার মার সঙ্গেই ধ্বস্তাধ্বস্তি সুরু ক'রে দেয়। এতবড় মহিলা।

খেলা আরম্ভ হল। একবার দু'বার। যেন ইচ্ছে করে মোনার মা সব প্রজাপতি গুর্খাকে ধরতে দিচ্ছেন, হয়ত বাগানসুদ্ধ প্রজাপতি তিনি ওকে দিয়ে দিতেন। খেলাচ্ছলেই এমন করছিলেন তিনি।

বললাম তো গুর্খার স্বভাব।

মহিলা একটু কাছে ঘেঁসেছিলেন। কনুইয়ের গুঁতো নয় এবার, বেমক্কা একটা ঠ্যাং গলিয়ে দিলে গুর্খা মার দুই পায়ের মাঝখানে আর ধুপ্ করে তিনি পড়ে গেলেন লতা-ঝোপের ওপর। আকাশ ছেয়ে গেছে প্রজাপতির হল্‌দে পাখায়।

আমরা নিথর নিস্পন্দ। মোনার দুই চোখ বড় হয়ে গিছল। আর চোখের নিমেষে গুর্খা যা করবার তাই করল। যন্ত্রণায় মহিলা একবার আঃ করে উঠেও থেমে যান।

গুর্খা উঠে দাঁড়াবার পর তিনি উঠে দাঁড়িয়ে কাপড় সামলান, চুল ঠিক করেন। হেঁচকা টান মেরে গুর্খা তাঁর বেণীসুদ্ধ খুলে ফেলেছিল। কেবল কি তাই, কানের পিছনে ঘাড়ে গুর্খার রাক্ষুসে দাঁতের কামড় আমাদের চোখ এড়াল না। রক্ত এসে গেছে।

'এসো, তোমরা চা খেয়ে যাও।' তারপরও সুন্দর হেসে মহিলা বলছিলেন, 'খেলতে গেলে অমন এক আধটু লাগেই।'

আমরা চা খাব কি।

সর্দার গুর্খা, যেন ভয়ঙ্কর অন্যায় করেছে, ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি গেট

পার হয়ে বেরিয়ে এল, সঙ্গে সঙ্গে আমরা। অবশ্য বাইরে অন্ধকারে এসে গুর্খা আমাদের কানে কানে বলছিল, 'আসল খেলোয়াড়ের মন ওঁর।'

আমরা কোনো কথা বলিনি।

বলতে কি, সেদিন থেকে, তারপর থেকে এ ধরনের খেলাই যেন আমরা মনে মনে খুঁজতুম। এমন সুন্দর হাস্যরসিকা মহিলার দেখা আর একটিও পাইনি। ক'টাই বা বাড়ি ছিল তখন ও'পাড়ায়।

চামচ

'কাল আসব।'

'এসো।'

'কাল আরো সুন্দর ফুল নিয়ে আসব।'

'এনো।' চোখ বড় করল চিত্রা।

'ভালো ভালো ফুল এসে গেছে এই চালানে।'

'বেশতো।' ঢোক গিলে ফুলওয়ালার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল চিত্রা চ্যাটার্জি। 'হ্যাঁ, ফুল ছাড়া আমিও একদম থাকতে পারি না।'

'সব আধুনিক মহিলা ফুল ভালোবাসেন, আজকাল আরো বেশি ভালোবাসছেন।' ফুলওয়ালা হাসল।

এবার ওর কথায় কোনো মন্তব্য করলনা যদিও চিত্রা। ছড়ানো ফুলগুলো একত্র বেঁধে একটা আঁটি করে সাইকেলের পিছনে চাপিয়ে লোকটি আর এক দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

চিত্রা চুপ করে ওর সাইকেল চালিয়ে যাওয়া দেখল। অশোক-কুঞ্জ থেকে মেনকা-লজে। কিন্তু মেনকা-লজের মেনকা, আর যা-ই রাখুক, ফুল রাখবেনা চিত্রা হলফ করে বলতে পারে। এ পাড়ায় একমাত্র ফুল কিনতে পারার মতন চাকরি করে অশোক। চিত্রার স্বামী। তা-ও রোজ দু'তিনটের বেশি ডালিয়া কিনতে পারে কি সে? যদিও চিত্রা এভাবে রোজ পয়সা নষ্ট করবে না, মানে ফুলওয়ালা জানুক যে, সে এপাড়ায় সকলের চেয়ে রূপসী

তো বটেই, সকলের চেয়ে বেশি ফুল কেনারও ক্ষমতা রাখে এবং ফুল-ওয়ালাকে রোজ এক ঘন্টার ওপর এই জানালায় ধরে রাখতে পারে কথাটা তাকে জানিয়ে লাভই বা কি ভাবতে ভাবতে চিত্রা এক সময়ে যেন আরো বেশি চুপ করে গেল। জানালা ছেড়ে ও এসে খাটের ওপর বসল।

যেন ফুলটা হাতে নিয়ে ফুলের ওপর এবার প্রথম চোখ পড়তে চিত্রাদেবী চমকে উঠল।

'ম্যাগ্নোলিয়া। গোল্ড্।'

ইংরেজী শব্দ দুটো।

ফুলওয়ালার নির্ভুল ইংরেজী উচ্চারণ মনে পড়তে ঠোঁট দুটো মনে পড়তে চিত্রা ফুলটা হাত থেকে নামিয়ে বিছানার ওপর রাখল।

যদিও চিত্রা জানে যে অশোক কিছু বলবে না, একটা ফুলের জন্য তার স্ত্রী ক্যাশবাক্স খুলে বারো আনা খরচ করে ফেলেছে ভাববার মত অর্থাৎ এই নিয়ে চিন্তা করবার মতন ছেলে অশোক নয়, তবু চিত্রার মনে-না-হয়ে পারল না অশোকের দৃষ্টি।

ফুলটার দিকে তাকাবেই না সে।

অর্থাৎ চিত্রা যে তার রুচি মতন একটা সুন্দর জিনিস কিনে রাখল ব্যাপারটাই অশোক লক্ষ্য করছে না।

অশোকের নিজের-কিনে-আনা জিনিসের দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করাবার লোভ বেশি, নির্লজ্জতা জাগে বেশি, ওর চোখ দুটো চিত্রার মনে পড়ল। 'এই ছাখো তোমার স্যাণ্ডেল।'

ফুল রেখে দিয়ে চিত্রা তখন হাতে নতুন স্যাণ্ডেল তুলে নেবে। নিতে বাধ্য হবে। কি এক বাক্স সাবান কি মাখনের কৌটো। এবং স্যাণ্ডেল পরে চিত্রা যখন বারান্দায় হাঁটবে আর চা খেতে খেতে অশোক ইজিচেয়ারে আধখানা হয়ে শুয়ে কলেজের গল্প করবে, কোন্ মেয়ে কি ভাবে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিল আর অশোক কি ভাবে তার স্টেপ্ নিয়েছে, বা কোন্ ছেলের অশিষ্টতার দরুণ কি শাস্তি দেওয়া হয়েছে এই সব গল্প করতে অশোক তার গণিতের তিন ঘণ্টা সময়ের পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করবে। এক সময় সন্ধ্যা হব হব করবে। প্রায়ান্ধকার ঘরে বিছানার একপাশে রেখে দেওয়া ফুলটা চোখে পড়বে না আর।

চা শেষ করে অশোক ক্লাবে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হবে।

আবার পাঞ্জাবী ধুতি, অধ্যাপকের গলায় চাদর।

আর যাবার আগে, ঘর ছাড়বার সময় কার্তিকের হিমটা-না-লাগে ভয়ে সে চিত্রার গলায় মোটা মাফ্‌লারটা জড়িয়ে যাবে নির্ভুল। নিয়মিত।

বিছানায় শুয়ে শিয়রে আলো জ্বেলে চিত্রা ঘণ্টা দুই ইংরেজী নভেল পড়বে।

কলেজ-লাইব্রেরী থেকে অশোক রোজ দু'টো করে নতুন বই আনছে। চিত্রার জন্যে।

চিত্রা অবসর সময়টা পড়াশোনা করে কাটাক, অধ্যাপকের এই ইচ্ছা।

খামোকা ঘরের কাজে সারাক্ষণ লেপটে থাকাও ঠিক না আবার বাইরে মিছিমিছি ঘোরাও অসঙ্গত।

'অর্থাৎ মাঝামাঝি রকম পথ অবলম্বন করাই মেয়েদের পক্ষে শ্রেয়।'

পৃষ্ঠা চার

অর্থাৎ যতক্ষণ না অশোক উপার্জনে অক্ষম হয়ে পড়ে।

তারপর তো আছেই এদিক-সেদিক। ভবিষ্যতে চিত্রাকে হয়ত চাকরি করতে বেরোতে হবে। কি চাকর তুলে দিতে হতে পারে। ঘরের কাজে একটু বেশি সময় চিত্রাকে লেগে থাকতে হতে পারে।

কিন্তু এখন, আপাততঃ।

অর্থাৎ অবস্থা সেরকম কিছু না ঘটলে পত্নীকে সে নিজের হাতে কিছু করতে দিচ্ছে না।

ততক্ষণ, তদ্দিন বরং চিত্রা ঘরে বসে কিছু বিলাতী বই শেষ করুক। অশোকের ইচ্ছে। বুদ্ধিমার্জিত সে নিজে, বিদ্যার দীপ্তি সহধর্মিণীর চোখে মুখে দীপ্ত হোক। নতুন পরিণয় তাদের।

এই সেদিন। সবে হয়েছে।

অশোককে খুশি রাখতে চিত্রা রাশি রাশি বই শেষ করছে।

ন'টার আগেই স্বামীর গৃহপ্রত্যাবর্তন। তারপর খাওয়া। তারপরে ঘুম।

লেপ মুড়ি দেওয়া নবদম্পতির আর একটি নিটোল নিশিযাপন।

এর মধ্যে ঘরে ফুল রাখা না-রাখার কথা ওঠে না। উঠেনি এখনও সেই প্রশ্ন।

এবং পরদিন সকালে হঠাৎ যদি এত বড় ম্যাগ্নোলিয়াটা অশোকের চোখে পড়ে কি বলবে, বলতে পারে অধ্যাপক, চিত্রা বসে বসে তা ততক্ষণ ভাবল।

তারপর সে ফুলটাকে তুলে রাখল তার চিঠির প্যাড, ছবির অ্যালবাম

ও পমেটমের কৌটোর পাশে। চামড়ার সুটকেইসের মধ্যে আটকা পড়ল নয়নাভিরাম কুসুম।

সুটকেইসের ডালা বন্ধ করে ফুলওয়ালাকে আর ধারে কাছে কোথাও দেখা যায় কিনা জানালায় মুখ বাড়াতে চিত্রার চোখ অশোকের চোখের ওপরে গিয়ে পড়ে।

বাঁ হাতে একটা বেড্‌কভার, ডান হাতে একটা ফুলকপি ঝুলছে স্বামীর।

'এই, ধরো ধরো।'

চিত্রা খাদ্য ও শয়নের সামগ্রী নিঃশব্দে হাতে তুলে নেয়।

আজও অশোকের কলেজে, তার ক্লাসেই একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল।

'কি ঘটনা?'

চিত্রা প্রশ্ন করল। না করাটা অশোভন।

'আজ ডলি মজুমদার একটা চাঁপা ফুল লুকতে লুকতে ট্রিগনোমেট্রি শুনছিল।' বলে অশোক হাসে।

'তুমি কি বললে শুনি?' অল্প হেসে চিত্রা উত্তর করে।

'বললাম ডিউটি ও বিউটি এক সঙ্গে চলে না এখানে।'

'কি বললে তারপর?'

'বললাম সে অন্য জীবনে।' অশোক গম্ভীর হয়ে পায়ের মোজা ছাড়ে। কি জীবন চিত্রা জানে। কা'দের জীবন।

সুতরাং এই নিয়ে স্বামীকে আর আলোচনার সুযোগ না দিয়ে চিত্রা চোখ বড় করল। করতে হ'ল তাকে নতুন বেড্‌কভারটা হাতে নিয়ে।

পাঁচটা ছয়

'কত দাম পড়ল ?'

'ন'টাকা।' অশোক মোজা ছেড়ে সিগারেট ধরায়। 'এই রং তোমার ভালো লাগবে আমি জানি। আর, কাপড়টার কি চমৎকার জমি ছাখো !' বলে সে নতুন বেড়কভারটি একবার নিজের গালে তারপর স্ত্রীর গালে ঠেকিয়ে বারবার ওর ভালত্ব মসৃণত্ব উপলব্ধি করার চেষ্টা করল।

চা খেয়ে অশোক ক্লাবে বেরিয়ে যাওয়ার পর চিত্রা ফুলটা আবার বাক্স থেকে বার করে।

ফুল ঘরে রাখার সার্থকতা সম্পর্কে ফুলওয়ালা তখন কি বক্তৃতা করছিল সে মনে করার চেষ্টা করল। ম্যাগ্নোলিয়া। গোল্ড।

ফুলওয়ালা দেখতে মন্দ নয়।

আরও জানি কি বলছিল তখন ? ভ্রূ কুঁচকে চিত্রা সবগুলো কথা মনে করার চেষ্টা করে। 'এই পাড়ায় আমি নতুন এসেছি। সবে ক'দিন ফুলবিক্রী করছি। মাপ করবেন, আপনাকে দেখেই আমার মনে হয়েছে আমার সব ফুলের চেয়ে দামী বড় ম্যাগ্নোলিয়াটা আপনার ঘরে মানাবে ভালো।'

কেন মানাবে চিত্রা আর প্রশ্ন করেনি। ফুলওয়ালা তখন চিত্রার কাছ থেকে একটা দেশলাইয়ের কাঠি চেয়ে সিগারেট ধরাতে ব্যস্ত।

'ম্যাগ্নোলিয়াটা ধরে রেখেছেন আপনাকে রাণীর মত লাগছে দেখতে।' চোখ বড় করেছিল ফেরিওয়ালা। যাবার সময়। জানালা ছেড়ে সরে যাবার আগে। আর ঘাড় নেড়ে বলছিল 'কাল, কাল আসব।'

চিত্রা কিছু জিজ্ঞেস করেনি।

নিজে থেকেই বলছিল ও, অল্প কদিন ফুল ফেরি করতে আরম্ভ করেছে। 'কিন্তু,—কিন্তু খদ্দের জুটছে না, পদ্দেরণী। আজকাল মেয়েরা ফুলের মর্যাদা ভুলে যাচ্ছে। অথচ, সবচেয়ে যে জিনিস তাদের প্রিয় হওয়া উচিত, কি,—ঠিক কিনা?'

চিত্রার ভুরুর ওপর চোখ রেখে ফুলওয়ালা জিজ্ঞেস করছিল।

তারপর আঁটি থেকে বড় ম্যাগ্নোলিয়াটা টেনে চিত্রার হাতে তুলে দিয়েছে।

'দেখবেন, ঘরে ফুল রাখলে রাত কত আরামে কাটে।'

রাত্রে শুয়ে রসিক ফুলওয়ালার কথা মনে পড়ল চিত্রার, হাসল ও।

সেই সুদূর সাদার্ণ এভিনিউ থেকে এসেছে। বাইক করে করে এই রোদে। পেট চালাতে হবে। একটা কিছু পেশা চাই।

অল্প পুঁজিতে আরম্ভ এই ব্যবসা। তারপর চোখ ছোট করে বলে সে, 'নরম, ভারি নরম ফুলেরা। ভুলে গেছে, মেয়েরা একদম ভুলে যাচ্ছে ঘরে ফুল রাখা ভালো, কত যে সরস লাগে জীবন, স্বপ্নময়।'

ঠোঁট টিপে ফুলওয়ালা চিত্রার চোখে চোখে চেয়ে ছিল, আর ফুল রাখার মাহাত্ম্য কীর্তন করছিল। পায়ে ছেঁড়া জুতো, গায়ে মলিন খদ্দর।

সে আশা করছিল ফুল বিক্রী করে এদেশে বড়লোক হওয়া যাবে, দেশ ততটুকুন সভ্য হয়েছে। কিন্তু বুঝি তার সেই আশা পুরল না, সেই হারে ফুল বিক্রী হচ্ছে কই, কেউ কিনছে না ফুল।

চিত্রা বড় ম্যাগ্নোলিয়াটা কিনছে দেখে তবু ফেরিওয়ালার ধারণা একটু বদলেছে। না, ম্যাগ্নোলিয়া কেনার মতো মেজাজের মেয়েও এদেশে আছে।

আ, যদি সে কোনোদিন বড়লোক হয় তবে চিত্রার মত দেখতে একটি

মেয়েকে বিয়ে করবে আর এই রকম একটা ম্যাগ্নোলিয়া বিছানায় রেখে ঘুমোবে।

ততক্ষণ আর কোন কথা বলে না চিত্রা।

নুয়ে ফুলওয়ালাও তখন গভীর মনোযোগের সঙ্গে সাইকেলের কেরিয়ারের সঙ্গে ফুলের মুঠাগুলো বাঁধছে, চামড়ার বেল্ট্ আঁটছে।

কোনো কথা না কয়েই চিত্রা জানালা থেকে সরে এসেছে। গাল লাল করে।

টুং করে সাইকেলের বেল্ বাজিয়ে লোকটা চলে গেছে।

চামড়ার সুটকেইসে সারারাত যেমন ম্যাগ্নোলিয়াটা আটকে রইল তেমনি আটকে রইল ওর বুকের মধ্যে ফুল-নাড়াচাড়া-করা একটি দুপুর, নিঝুম। ইচ্ছা করে চিত্রা খুললে না।

ইচ্ছা করেই বললে না ও ফুলের কথা।

অধ্যাপকের এই জিনিসে আগ্রহ কি বৈরাগ্য তা-ই যখন জানা যায় না।

তাই চিত্রাও চুপ।

আর, মসৃণ লেপ-মোড়া নিশিযাপনান্তে এমনি যখন একটি স্বচ্ছ সকাল এল।

ফুল ছাড়াও সুন্দর সকাল আসে অধ্যাপকের ঘরে। চা রুটিমাখন খবরকাগজ সিগারেটের ছাইদানীর ওপর উপুড় হয়ে পড়ে অশোক কথা বলে।

কথা বলছে আর হাসছে। আর পায়চারী করে চিত্রা শুনছে। 'রং দেখেই মনে হয়েছিল একটা অদ্ভুত রাত কাটবে শুয়ে ওতে, কেটেছে তো?'

চিত্রা থুঁতনি নাড়ে।

টেবিলের ওপর ছড়ানো খবরকাগজের ওপর একজোড়া খুশী চোখ। সন্ধ্যায় পরমোৎসাহে বিছানার চাদর কিনে আনার কাহিনী সকাল অবধি টেনে এনেছে। আনল অশোক।

'আজ আর কিছু তোমার জন্যে কিনতে হবে কি?' স্বামী পরে প্রশ্ন করল।

চিত্রা মাথা নাড়ল।

'মিছামিছি পয়সা নষ্ট।'

'কি যে বলো।' একটু দুঃখ পায় যেন অধ্যাপক। ক্ষৌরকর্ম আরম্ভ করে।

তারপর রৌদ্রে টুল টেনে নিয়ে বসে খালি গায়ে সরষের তেল ঘসে। ভিটামিন ডি।

আর কথা বলে চিত্রার সঙ্গে। 'আর একটু বেশি ঘি দিলেও পার।' গায়ে তেল ডলতে ডলতে অশোক হেসে বলে, 'সত্যি দুপুরবেলা টিফিনরুমে বসে তোমার দেওয়া হালুয়াটা যখন খাই তোমার তুলতুলে আঙুলগুলোর কথা মনে হয়, যেন তোমাকে—' কথা অসমাপ্ত থাকে অশোকের।

চিত্রা গাল লাল ক'রে খবরকাগজটা গুটিয়ে রাখে। 'আহা, ঐ তো একটা জিনিস করে দিই নিজের হাতে, সব তো তোমার ঝিই করছে।' আস্তে আস্তে বলে সে।

'তাই, সেকথাই বলছিলাম।' তেলমাখা শেষ করে স্বামী মাথায় পিঠে জল ঢালে। 'এই জন্যেই তো ঐটুকুন এত মিষ্টি।'

পৃষ্ঠা দশ

চিত্রা চুপ।

'ব্রাউনিংটা শেষ করে ফেল।'

চিত্রা ঘাড় নাড়ে।

'কাল থেকে তোমায় আমি বার্নাড শ পড়াতে দেব।'

'দিও।'

চিত্রা টেবিলে খাদ্য সাজিয়ে দেয়। তোয়ালে দিয়ে মাথা মোছা শেষ করে অশোক হৃষ্টচিত্তে খেতে বসে।

খাওয়া শেষ হলে চিত্রা স্বামীর হাতে জল ঢেলে দেয়। মশলার কৌটো এনে সামনে ধরে।

একটি এলাচদানা দু'টো লবঙ্গ মুখে পুরে অধ্যাপক কাপড় পরে, পাঞ্জাবী গায়ে চড়ায়, চাদর গলায় ঝোলায়।

চিত্রা হেসে বিদায়-সম্বর্ধনা জানায়। এবং স্বামীকে আরো বইয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় কলেজ-লাইব্রেরী থেকে ধার আনতে। মাথা নেড়ে অধ্যাপক বেরিয়ে যায়।

যেমন রাতটা লেপ মুড়ি দিয়ে কেটেছে দুপুরটা এখন বই মুড়ি দিয়ে কাটবে স্বামী বেরিয়ে যেতে কথাটা মনে পড়ে হাসে চিত্রা।

তারপর ও সোজা এল জানালায়।

জানালার পর্দাটা বাঁ-হাতে গুটিয়ে দেয়। সুন্দর মুখ বার করে ধরে বাইরের রৌদ্রে। অশোক চলে গেছে. এখন আর দেখা যায় না।

'হ্যাঁ, রক্তগোলাপ নূরজাহানের হাতে থাকত।' ফুলওয়ালা হাসে

চিত্রাও হাসে।

'তুমি ইতিহাস-টিতিহাস পড়েছো মনে হয়।'

'কিছু কিছু। আই-এ অবধি পড়েছি তারপর প্রেম করে পড়া ছেড়েছি।' অন্যদিকে চোখ রেখে ফুলওয়ালা কথা কয়।

'কে সেই মেয়ে, কোথায় এখন?' প্রশ্ন করতে পারতো ও, কিন্তু করল না, চুপ করে গেল চিত্রা।

'দেশলাই।'

চিত্রা দেশলাই এনে দেয়।

রংচটা পুরোনো একটা সিগারেট-কেস্ থেকে সস্তা একটা সিগারেট তুলল ছেলেটি।

'সেই মেয়ে আছে এখনও এই শহরে।' নিজে থেকেই ফুলওয়ালা বলল, 'এই আপনার মতই কোনো প্রফেসার কি মুন্সেফের গিন্নী হয়েছে। লেখাপড়া করলাম না নিজে তাই ভালো চাকরিবাকরি জুটল না। ফুল ফেরি করি এখন।' ফুলওয়ালা ঠোঁট ফাঁক করে চেয়ে থাকে।

'কেউ কিনছে না বুঝি ফুল?' অন্যদিকে তাকিয়ে চিত্রা বলে।

'না, বললাম তো কাল আড়াইঘণ্টা ঘুরে তারপর ম্যাগ্নোলিয়াটা আপনার কাছে বিক্রী করতে পারলাম।'

চিত্রা চুপ।

কুচকুচে কালো চুল বাঁহাতের লম্বা আঙুল দিয়ে কপালের পিছনের দিকে ঠেলে দিয়ে ছেলেটি চুপ থেকে সিগারেট টানল।

একটুপর সে হাসল।

'গোলাপ দু'টো আমি রাখব, রাখলাম।'

হৃষ্টমনে ফুলওয়ালা বাকি ফুলগুলো কেরিয়ারে তুলল। 'কাল আনব মুচকুন্দ আর ভুঁইচাঁপা। রজনীগন্ধা এখন যোগাড় করা মুশকিল।'

'হ্যাঁ, দেশীফুল এনো, ভুঁইচাপা আমি ভয়ানক ভালোবাসি।' চোখ বড় করল চিত্রা।

'বাস্, তবে আর কি।' ফুলওয়ালা চোখ নামালো। 'জীবনটা শুধু ফুল নিয়ে আমরা কাটাতে পারি না বলে যা দুঃখ, কি বলেন?'

'এনো, রোজ আমি কিনব, আমার ফুলের শখ মরে যায়নি।' চিত্রা হাসল।

'দেখছি, রোজ সেরা ফুলটি এনে আপনাকে দেব।' চাপা কণ্ঠস্বর ছেলেটির।

দৃঢ়বদ্ধ-অধরোষ্ঠ চিত্রা।

তখন, আলতো হাওয়ায় একটা নড়বড়ে পাপড়ি গোলাপ থেকে খসে পড়ে মাটিতে।

যেন অস্ফুট যন্ত্রণায় চিত্রা 'উ' করে উঠল।

'আর পড়বে না।' ফুলওয়ালা রক্তগোলাপ দু'টোর দিকে আঙুল বাড়িয়ে আশ্বাসবাণী শোনায়। 'একেবারে টাটকা, দেখছেন তো আজ সকালে গাছ থেকে তোলা হয়েছিল। সাতদিন আপনি ফুলদানীতে জীইয়ে রাখুন, গ্যারান্টি দিচ্ছি, কিচ্ছু হবে না।'

'আচ্ছা, আচ্ছা।' মৃদু মধুর গলায় চিত্রা হাসল।

যদিও হাসিটা ওর থেমে গেল হঠাৎ পাশের বাড়ীর কোনো জানালার

খড়খড়ির আওয়াজে। একটু চমকে ওঠে, তখন, গোলাপের পাপড়ি খসার সময় যেমন ও চমকে উঠেছিল।

ফুলওয়ালা চলে যেতে জানালার পর্দা টেনে দিয়ে গোলাপ ছু'টো টেবিলে শুইয়ে রাখল চিত্রা, আর কোলে বইটা টেনে নিলে। প্রায়-শেষ-ক'রে-আনা ইংরেজী উপন্যাস। আজ শেষ করতে হবে।

আপনারা বলছেন সাহসের অভাব?

তা না। তাই কি?

ঘরে কি এমনি যথেষ্ট বসন্তের হাওয়া লাগে না, ফুটন্ত ফুল সাজিয়ে রাখা ছাড়াও?

বিশেষ, এই ঘরে এসে, অশোক যখন কথা কয়, যখন হাসে কি নিশ্বাস ফেলে চিত্রার চোখে চোখ রেখে? কি চিত্রাকে ধরে?

অন্ততঃ চিত্রা তাই মনে করে, হাবভাবে অশোক তাই মনে করিয়ে দেয়। দিচ্ছে।

গোলাপ ছু'টো হাতে করে খাটে বসে ঘরের সর্বত্র চোখ বুলোতে বুলোতে চিত্রা অনেকক্ষণ ভাবল।

সুতরাং থামোকা—আর তা ছাড়া লজ্জাও তো করে। যখন এই নিয়ে আগে কথা হয়নি।

'হঠাৎ এই বিকেলে টেবিলে রক্তগোলাপের সমারোহ যে?' অবাক চক্ষু, আশ্চর্যান্বিত ভ্রূযুগল।

ভেবে ভেবে ফুল ছু'টোকে চিত্রা অবশেষে সুটকেইসে পুরল।

আর ওর ফুলের ভাবনা শেষ হতে না হতেই অশোক এসে পড়ল।

'অলিভ অয়েল।'

'কা'র?'

'তোমার।'

একটুক্ষণ থেমে থেকে অশোক বলল, 'দু'টো দিন শুধু নিয়মমত মেখো। চামড়া কি অদ্ভুত সফ্‌ট আর পালিশ করে দেয়। হ্যাঁ, রাত্রে শোয়ার আগে মাখবে।'

চিত্রা খুশি চোখে চামড়া পালিশ-করা তেলের শিশি হাতে তুলে নিলে।

'অবশ্যি তোমার গায়ের চামড়া এমনিও খুব পালিশ। তবু, বুঝলে না? শীত পড়ছে। ওসব একটু মাখতে টাখতে হয়।'

'মাখব।' পত্নী উৎসাহে মাথা নাড়ল। অধ্যাপক গায়ের চাদর রাখল, পাঞ্জাবি ছাড়ল।

চিত্রা চা এনে দিলে। চায়ের ধোঁয়ার সঙ্গে অশোকের মেজাজ আরো খুলল। এতক্ষণ জুতোয় চাদরে জামায় কলেজী গন্ধ নিয়ে যেটুকু রেখে ঢেকে বলছিল এবার সে তা টেবিলের ওপর উপুড় করে ধরল। চেয়ারে গা এলিয়ে দিলে অধ্যাপক।

'সত্যি ভয়ানক পালিশ তোমার গায়ের চামড়া।'

'কেন, কি ক'রে এত বোঝ।' চিত্রা হাসে।

'বুঝি, বুঝেছি বলেই তো এতবার বলছি।' পেয়ালায় মুখ নামাতে নামাতে অশোক ঝুর্‌ঝুর্‌ করে হাসল। মার্জিত তীক্ষ্ণ হাসি।

বসন্তের হাওয়া ঝিলিক দিয়ে গেল ঘরে। অশোক অতঃপর তার কলেজের গল্পে ফিরে এল।

'জানো ডলি আজ কি কাণ্ড করছিল ?'

'কি ?' চিত্রা চোখ তুলল।

'আমায় জব্দ করবার চেষ্টায় ছিল মেয়ে।'

'কেন, ও—' চিত্রার মনে পড়ল কালকের গল্প। 'ফুল লুফতে ক্লাশে বারণ করেছিলে সেই রাগ ?'

অশোক মাথা নাড়ল।

'কি করেছে শুনি ?' গল্পটা শুনতে চিত্রার ভারি কৌতূহল।

'আজ কলেজ থেকে বেরিয়ে দেখি শ্রীমতী উল্টো ফুটপাথের ফুলের দোকান থেকে ঘটা করে ফুল কিনছে। এতবড় একটা তোড়া নিয়েছে বগলে, তারপরও কিনছে।'

'তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে ?'

'আমি ওর দিকে তাকাইওনি।' গম্ভীর গলায় অধ্যাপক বলল, 'বাস্-এর জন্যে আমায় একটু সময় দাঁড়াতে হয়েছিল।'

চিত্রা চুপ করে চায়ের পেয়ালা পিরিচ সরায়।

'কিন্তু আমি ভাবি, বাড়ি ফিরতে ফিরতে কেবলই মনে হয়েছে কী হবে অত ফুল কিনে। একলা জীবন, বাজারের সব ফুল কিনে নিয়ে গেলেও তোমার ঘরে বসন্ত আসছে না মেয়ে,—সে অন্যসময়, আর এক জীবনে। কি বলো, ঠিক কি না ?'

'না, কুমারী জীবনে ফুলের প্রশ্রয় নেই।' চিত্রা না বলে পারলে না।

পৃষ্ঠা ষোল

'সেই, তাই।' পত্নীর মুখের দিকে হাস্যবিচ্ছুরিত চক্ষুদ্বয় তুলে ধরল অধ্যাপক। 'কিন্তু ছাত্রীকে তো আর সে কথা ভেঙ্গে বলা যায় না।'

'বললেই বা।' চিত্রা ঠাট্টা করল।

'আরে রাম!' অধ্যাপক মাথা নাড়ল, 'মাস্টার ছাত্রীর সম্পর্ক স্ট্রিক্ট্ না থাকলে চট্ করে বদনাম ওঠে, কেরিয়ার খারাপ হয়, শুধু আমার বেলায় নয়, সব মাস্টারের বেলায়ই। চোখের ওপর কত ভালো ভালো প্রফেসারকে নষ্ট হয়ে যেতে দেখলাম।'

চিত্রা চুপ করে রইল।

অশোক ক্লাবে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়। 'কি তোমার বার্নার্ড শ কদ্দূর?' গলায় চাদরের প্যাঁচ দিতে দিতে অশোক প্রশ্ন করল।

'হবে, আজ রাত্রে শেষ করতে পারব।'

'গুড্।' হৃষ্টচিত্তে অশোক চলে যাচ্ছিল, ফিরে দাঁড়ায়। 'রাত্রে আজ হাঁসের ডিমের ঝোল আর ছোলার ডাল হোক। ঠাণ্ডা পড়েছে, রুটির সঙ্গে—বুঝলে না? বনবে ভালো।'

চিত্রা ঘাড় নাড়ল।

'উত্তরের জানালাটা বন্ধ করে দাও, ঠাণ্ডা আসছে।'

চিত্রা উত্তর দিকের জানালা বন্ধ করল।

'আর, রান্নাঘরে বেশিক্ষণ বসে থেকে তোমার কাজ নেই, বলে দিও, সদু বেশ নামাতে পারবে। ততক্ষণ খাটে শুয়ে তুমি বইটা পড়ো।'

চিত্রা ঘাড় কাত করল।

অশোক বেরিয়ে গেল।

এবং রান্নাঘর পর্যন্ত ধাওয়া না করে এখানে দাঁড়িয়েই চিত্রা ঝি সৌদামিনীকে রান্নার আয়োজন বুঝিয়ে দিয়ে খাটে এসে বসল। উপুড় করে রাখা খোলা বই কোলের ওপর টেনে তুলল। একটু সময়।

তারপর বইটা আবার বিছানার ওপর রেখে দিয়ে বাক্স থেকে গোলাপ দু'টো বার করল ও। একটু নির্জীব হয়ে গেছে এরই মধ্যে— পাপড়িগুলো কেমন মুখ থুবড়ে পড়ছে বন্ধ জায়গার গুমোটে থেকে। চিত্রার কষ্ট হল।

একটা পাপড়ির ওপর ঠোঁট রাখল ও। যেন গোপনে আদর করল গুপ্ত কুসুমকে। একবার উঠে আয়নায় দাঁড়াল ফুল হাতে।

তারপর সন্তর্পণে, যেন অ্যালবামের চাপে নষ্ট না হয়, পমেটমের কৌটোর ভারে থেঁতলে না যায় পাপড়ি, গোলাপ দু'টোকে সুটকেইসের মধ্যে একটি অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গায় রেখে দিয়ে ডালা বন্ধ করল। তারপর কোলে টেনে নিলে বই। কতকক্ষণ।

যেন কোনোরকমে ক্লাব সেরে অধ্যাপক হুড়মুড় করে আবার ফিরে আসে বাড়িতে।

'ওঠ, খাও।'

করমচার মতো লাল লাল চোখ চিত্রার। কিছুটা বই পড়ে, ঘুমিয়ে কিছুটা।

অশোক হাতের ধাক্কায় স্ত্রীকে জাগায়। 'এরি মধ্যে ঘুম।' বলে সে হাসে।

'কি করব একলা একলা ?' চিত্রাও হাসে।

'বই শেষ ?'

'অনেকক্ষণ।'

'তাই বলো।' আনন্দে অধ্যাপক চক্ষু বিস্ফারিত করে। চাদর রাখে গলা থেকে নামিয়ে, পাঞ্জাবি খোলে। শুধু গেঞ্জি আর পরিধানে লুঙ্গি।

সৌদামিনীর রাঁধা ডিম, ডালের বাটি এনে চিত্রা টেবিল সাজায়।

'এক সঙ্গে।' অশোক বলল। চিত্রা নিজের ডিম ও ডালের বাটি এনে টেবিলে তুলল।

'এক সঙ্গে শুতে হবে। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর এক সঙ্গে বসে খেতে দোষ, শাস্ত্রের বিধান চমৎকার।'

বলে অশোক হা-হা করে হাসে।

হাসতে হাসতে দুজন এক সঙ্গে আহারে বসল।

তারপর গল্প।

খাওয়া শেষ হলেও গল্প শেষ হতে চায় না। কিন্তু এক সময় অশোক থামবে, একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর আর সে গল্প করে না।

পরদিন সকালে চায়ের টেবিলে বসে অধ্যাপক অল্প অল্প হাসে।

'কি ব্যাপার ?' চিত্রা প্রশ্ন করে।

পত্নীর চোখে মুখে পরিতৃপ্তির চিহ্ন। যেন সেটা লক্ষ্য করেই অশোক আরও বেশি উদ্ভাসিত হয়।

'কাল তুমি যখন ঘুমিয়ে পড়লে হঠাৎ আইডিয়াটা মাথায় এলো।'

'কি ?' চিত্রা চোখ তুলল।

একটু চুপ থেকে অশোক বলল, 'এভাবে সেভাবে কত পয়সা তো

আমরা নষ্ট করি। রোজ একটি দু'টি ফুল কিনে ঘরে রাখলে মন্দ হয় না। কি বলো?'

হঠাৎ কিছু বলতে পারলে না চিত্রা। কাপে চিনি ঢেলে চামচটা নাড়ছিল, হঠাৎ ওর দুই আঙুলের মধ্যে ওটা স্থির শক্ত হয়ে গেল। এক মুহূর্ত। তারপর ছোট একটা ঢোক গিলে চামচটা বেশ জোরে নাড়তে নাড়তে বলল, 'ভালোই ত।'

'শুধু ভালো নয়, প্রয়োজন।' অধ্যাপক দুই চোখ বিস্ফারিত করে স্ত্রীকে বোঝায়, 'গৃহিণী ও গৃহকর্তার সুরুচির পরিচয় দেয় ওতে। খাওয়া পরায় যথেষ্ট খরচ করি বটে, কিন্তু,—অ্যাস্থেটিক সেন্স যেটা, তা যদি, সেটা যদি—'

'বেশতো।' যেন গৃহকর্তা ইতস্তত করছিল, গৃহিণী অভয় দিলে। 'কত আর পয়সা লাগে, কী এমন খরচ, দু'টো একটা ভালো ফুল ঘরে রাখতে।'

'তবে তাই করা যাক, আজ থেকেই বরং।' গদ্গদ্ গলা অধ্যাপকের।

চিত্রা বলল, 'আজ বিকেলে কলেজ সেরে যখন ফিরবে দু'টো ফুল কিনে এনো।'

'এই ছাখো, তবেই সেরেছে।' অধ্যাপক এত জোরে হাসে যে তার চায়ের বাটি থেকে চা চল্‌কে খানিকটা মাটিতে পড়ে। 'কাল বিকেলে ডলিকে ফুল কিনতে দেখে না ফুলের কথাটা উঠল, মনে পড়ল। রোজ কি আর,—চব্বিশ ঘণ্টা আমার মাথায় যে সাইন্-থিটা কস্-থিটা ঘুরছে।'

অধ্যাপকের অসহায় চোখের দিকে তাকিয়ে চিত্রা হাসল। 'তা হলে কি হবে?'

'কেন, কোনো ফেরিওয়ালা আসেনা এদিকে ফুল নিয়ে?' অশোক

সোজা হয়ে বসল। 'নিশ্চয় আসে, তুমি লক্ষ্য কর না। আমার তো মনে হয় তুমি এই জানালায় বসেই ফুল কিনতে পার।'

'পাবি?' চকিতে জানালায় চোখ বুলিয়ে চিত্রা স্বামীর চোখে চোখ রাখল।

'হ্যা, হ্যা, একজন না একজন কেউ ফুল নিয়ে আসবেই। শহরে আবার ফুলওয়ালার অভাব।'

'বেশতো', ঠোঁট টিপে চিত্রা হাসল। 'দেখি যদি কেউ নিয়ে আসে ফুল আমি রাখব। তুমি তাহলে সুন্দর একটা ফুলদানী কিনে এনো।'

'আনব।' অশোক বলল, 'কি ফুল রাখবে, কি তোমার পছন্দ?'

'তুমি বলো।' চিত্রা স্বামীর কোল ঘেসে দাড়ায়। 'যে ফুল তুমি ভালোবাস, যদি পাই তাই কেনা যাবে।'

অধ্যাপক প্রবলবেগে মাথা নাড়ল।

'না না, তা হয়না। তুমি, তোমার ভালোলাগাটাই বড় কথা। আমার ফুল ছাড়াই এতকাল চলছিল বা একটি ফুল তো ঘরে ফুটে রয়েছেই, নয় কি?' বলে মৃদু মৃদু হাসে অশোক, চিত্রা গাল লাল করে।

আলাপে প্রলাপে ঈষৎ-তেতে-ওঠা রোদে মধুর হেমন্ত-সকাল গরম মুড়ির মত মুড়মুড়ে হয়ে ওঠে। হাই তোলে অধ্যাপক। স্নানের বেলা হল কলেজের বেলা হল।

'কিন্তু কথায় কথায় তুমি আমার নতুন বই আনতে ভুলো না।'

'পাগল।' মশলা চিবোতে চিবোতে অধ্যাপক গলায় চাদর জড়ায়। 'ঠিক আনব বই।'

'আর ফুলদানী ?'

'নিশ্চয়।' মৃদু মধু হেসে অশোক বারান্দা পার হয়ে রাস্তায় নেমে যায়।

খাটে বসে চিত্রা ভাবে।

ফুল ফুল,—কি ফুল।

নিজের মনে বেশ কিছুক্ষণ হাসল চিত্রা।

গোলাপ ম্যাগ্নোলিয়ারা শুকিয়ে গেছে।

তাতে কি ?

আছে মুচকুন্দ, ভুঁইচাঁপা, মুঠোমুঠো রজনীগন্ধা। এক টাকা বরাদ্দ হয়েছে ফুলের জন্যে, চিত্রা যদি হাত খরচের টাকা থেকে এর সঙ্গে আর একটা আধুলী যোগ করে দেয় ফুলের তোড়াটা বেশ মোটা হয় সুন্দর হয় দেখতে।

দেড় টাকায় ক'টা মুচকুন্দ দেবে ও? নিজেকে জিজ্ঞাসা করলে ও তারপর চমকে উঠল। কে?

সাইকেলের বেল আরো জোরে ক্রিং করে উঠল।

'আজ একটু সকাল সকাল এসে গেছ?'

'তাই কি?' মৃদুমন্দ হাসে ফুলওয়ালা। এখনও খাট থেকে উঠে গিয়ে সবটা পর্দা সরিয়ে দেওয়া হয়নি চিত্রার। জানালার বাইরে ফুলওয়ালার কপাল চোখ নাক ও ঠোঁট জেগে আছে চিত্রার চোখে পড়ল।

'ভাবছিলাম আজ বুঝি আর তুমি আসবে না।'

'না এসে পারি?' দাঁত বার ক'রে যুবক হাসে, কপালের লম্বা চুল

পিছনের দিকে ঠেলে দেয়। 'উঠুন, আসুন।' সরে এসে গরাদের সঙ্গে কপাল ঠেকিয়ে দাঁড়াল ফেরিওয়ালা।

কনুইয়ের ওপর শিথিল তনুর ভার রেখে চিত্রা মাথাটা জানালার কাছে বাড়িয়ে দেয়। কেউ দেখল না।

'আজ যদি তোমার কাছ থেকে কিছু না রাখি? এমনি ফিরিয়ে দিই?' চাপা হাসল চিত্রা।

'ভাবব আমার কপাল মন্দ।'

ফুলওয়ালা এদিকে ওদিকে তাকায়। তারপর ঢোক গিলে অল্প অল্প হাসে। 'কেন, কর্তা কাল রাগ করেছেন ফুল রেখেছিলেন বলে?'

'কারো কর্তা রাগ করে নাকি ফুল রাখলে?'

'করে বই কি?' ফুলওয়ালা অনেকটা মেয়েদের মতন দাঁত দিয়ে ঠোঁটের কোণা কামড়ায়। 'যদিবা দু'একজনের শখ থাকে, স্বামীদের জন্য তাঁরা পারেন না ফুল কিনতে। কি বাজে পয়সা নষ্ট, তাইতে—'

'তাইতে কি?' চিত্রা উঠে দাঁড়াল। হাত দিয়ে খোঁপা ঠিক করল। 'কাল একটা ফুল কিনেছিলাম। আজ উনি আমায় তিনটে ফুল কিনতে বলেছেন। ইয়ারকি!' প্রায় জানালার কাছে সরে গেল চিত্রা।

'বুঝলাম।' গলার স্বর নামল ফেরিওয়ালার, দীর্ঘশ্বাস পড়ল। 'আপনার স্বামী আপনার হাতের মুঠোর মধ্যে।' তারপর আকাশের দিকে চেয়ে সে বলল, 'সবাইর স্বামী যদি এমনটি হতো তো আমি কি আর ফুলের ব্যবসা ছাড়ি?'

'ছেড়ে কিসের ব্যবসা করবে, আর কি ফিরি করছ শুনি?' চিত্রা হাসতে গিয়ে থামে।

'আসুন, এসে দেখুন। আজ আবার এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন কেন?' ফেরিওয়ালা ডাকল।

চিত্রা তখনও দাড়িয়ে. আঁচলের আধখানা খাটের সম্পর্ক ছাড়েনি। এক হাতে মশারির একটা স্ট্যাণ্ড্ ধরে দাঁড়িয়ে যেন কি ভাবছে ও।

'ফেরিওয়ালা বলে ঘৃণা করছেন নাকি?' যুবক বলল।

'ঘৃণা? কাকে?' চিত্রা আঁচলের সবটা গুটিয়ে কিছু বুকের উপর রাখল, বাকিটা কাঁধে। 'মানুষের অবস্থা কি সমান যায়।'

বোঝাল ও অথবা যেন নিজের মনে বলল, 'পড়াশোনা বন্ধ না করলে তুমিও তো—?'

'বড়লোক কি আর হতে পারতুম।' যুবক এবার বড় করে হাসল। 'কই, আসুন নিন্। কপাল ভালো থাকলে এমন ফুলের ব্যবসাটাই বা রাতারাতি ছাড়ি কেন?'

'দাঁড়াও, তুমি তো আবার সিগারেট খাবে' হাল্কা স্বরে বলল চিত্রা, তারপর খাটের কাছে সরে গিয়ে বালিশ হাতড়াতে লাগল, ওর নিজের বালিশের তলা। বাড়তি একটা দেশলাই ও এই উদ্দেশ্যেই রেখেছিল।

'দিন্।' গরাদের এপারে হাত চলে এল ফুলওয়ালার। দেশলাইটা ওর হাতে ছেড়ে দেওয়ার পর চিত্রার চোখ গেল ফেরিওয়ালার অন্য হাতের দিকে। চেয়ে রইল।

'ভারি সুন্দর!' চিত্রা ঝিকিয়ে ওঠে। 'কত করে?'

পৃষ্ঠা চব্বিশ

'ছ'টাকা ডজন। আসল।' সিগারেট ধরিয়ে যুবক বলল, 'প্রথমেই আপনার কাছে ছুটে এলাম। নিন।'

'বাবে!' চিত্রা একটা চামচ হাতে তুলে নেয়। 'কদ্দিন মনে মনে আমি এই ডিজাইনের চামচ খুঁজছি, আশ্চর্য।'

'আমি জানি। আমি কি জানিনা, এই জিনিস আপনার একটা দরকার!'

চিত্রা হঠাৎ কথা বলল না।

'নিন।' গম্ভীর হয়ে গেল ফেরিওয়ালাও। 'এই চামচে ক'রে বাবুর কাপে আজ চিনি ঢালবেন। ক'টা রাখবেন?'

'একদিনে যদি ক'টা রেখে দিই তো কাল রাখব কি?' চিত্রা অল্প হাসল। 'না কি কাল পর্যন্ত এই ব্যবসা টিকবে না?'

'কে জানে বিধিলিপি কি আছে?' মৃদু হেসে যুবক হাতের বাকি চামচগুলোয় ফিতে জড়িয়ে একটা বাণ্ডিল করে বাণ্ডিলটা সাইকেলের পিছনে রাখল। 'কিন্তু ফুলের চেয়ে এ জিনিস দরকারী, অনেক বেশি কাজে লাগে, নয় কি।' ফেরিওয়ালা ঘাড় তুলে পরে বলল, 'মজবে না, শুকোবে না।'

'হ্যাঁ, তা বটে। অদ্ভুত জিনিস। ইস্, কি পালিশ চামচের হাতলটা।' আঙুল দিয়ে চামচের পালিশ অনুভব করতে করতে চিত্রা ফেরিওয়ালার চোখে চোখ রাখল।

'নিন, ধরুন।' দেশলাই ফিরিয়ে দিয়ে যুবক সোজা হয়ে দাঁড়ায়, সাইকেলে চড়বে।

'হাসছো যে?' প্রশ্ন করল চিত্রা। ও'কান লাল। একটু দ্রুত নিশ্বাস ফেলল ও।

'না এমনি। ভাবছি এই চামচ দিয়ে চায়ের বাটিতে চিনি ঢেলে দিলে বাবু আজ খুব খুশী হবেন, খুশী হয়ে—'

'কি, থামলে কেন, বলো?' গরাদের বাইরে হাত বাড়াল, হাত নাড়ল।

ফেরিওয়ালা কথা কইল না। যেন তার আগেই পাশের বাড়ির কোনো জানালার খড়খড়ি পড়ার জোর আওয়াজ হল। যেন নিঝুম পাড়াটা একবার কেঁপে উঠল। তারপর চুপ।

'হ্যাঁ, খুশী হবেন।' চামচের পেট দিয়ে আপন গাল ঘসতে ঘসতে চিত্রা আস্তে বলল, 'কিন্তু ওঁকে আমি চিনি কম দিই।'

কথাটা মোটেই ফেরিওয়ালার কানে যায়নি। তার আগেই সে সাইকেল চেপেছে। তার আগেই বেল্ বাজিয়ে স্থরকি ছেড়ে পিচের রাস্তায় নেমে গেল।

হেমন্তের বেলা। কতক্ষণ?

দেখতে দেখতে সোনালী রোদ কমলা রং ধরল।

কিন্তু বিকেল আসছে জেনেও চিত্রা খাট ছেড়ে উঠল না। উঠতে ইচ্ছা হয় না ওর।

স্তূপ-স্তূপ আলস্য নেমেছে শরীরে, চোখে, বিস্রস্ত শাড়ি শায়ায়। যে কেউ এক নজর দেখে বুঝতে পারবে। যেন আলস্যে খান্ খান্ হয়ে ভেঙ্গে পড়ে আছে ও খাটের ওপর, শুয়ে আছে, হাত-পা ছড়ানো, নতুন কেনা চামচটা বই-এর গায়ে ঠেকানো। এমন ভাবে আছে ওটা যে, দেখে চিত্রার হঠাৎ হাসি পেল। চামচটাকে অনায়াসে এখন একটি মেয়েমানুষ ভাবা

যায়। নয় কি? ভাবল চিত্রা। লম্বা ঋজু ঝক্‌ঝকে হাতলটাই আরো বেশি মনে করিয়ে দিল তাঁকে একথা।

আর এক বার কল্পনা করল ওটাকে সুস্থদেহ দীর্ঘ এক যুবক। যেন এক-চাকার একটা সাইকেলে চেপে বসেছে। অচল অবশ আঙুলে চামচটাকে তেমনি উল্টো করে ধরে ও সাইকেলের মত চালালো একটুক্ষণ। তারপর ফের বই-এর গায়ে ঠেকিয়ে রাখল।

একটা টিকটিকি কোথায় টিক্‌টিক করে উঠল।

অলস কল্পনায় ও বুঁদ হয়ে আছে, টের পেয়ে একসময় আড়মোড়া ভেঙ্গে সোজা হয়ে বসল। তারপর বসল চুল বাঁধতে।

না, নিছক আলস্যবশতঃ যে নতুন চামচটাকে ও সংসারে বাড়ালো না, কি ভালো করে ধোয়ামোছা করতে হবে, বীজাণুমুক্ত করে বাইরের এই ক্ষুদে বাসনাটিকে খাদ্যের সংস্পর্শে আনতে হবে সে জন্যে থামল না ও। বরং সংসারে রাখলনা সে ওটা অন্য কারণে।

এখানে চিত্রা পাকা গৃহিণী।

আরো দু'তিনটে চামচ আছে চায়ের, নিত্য ব্যবহারের। সুতরাং খামকা—

চামচটাকে ও ওর সেই সুটকেইসের মধ্যে ঢোকালে। গোলাপ ম্যাগ্নোলিয়া পাউডার পমেটমের কৌটোর সঙ্গে রেখে দিয়ে নিশ্চিন্তমনে এবার সে তার বিস্রস্ত বসন সজ্জিত করতে লাগল। রোদ একেবারে নিভে গেছে। অধ্যাপক মশায়ের ফুলদানী কিনে বাড়ি ফিরতে আজ বেশ দেরি হয়ে গেল ভেবে চিত্রা আয়নায় দাঁড়িয়ে ঠোঁট টিপে হাসল।

বেঙ্গমা-বেঙ্গমী

পাগল করে দিলে ও আমাদের। চব্বিশজন যুবক, ফরডাইস লেনের দিক্‌পাল ক্রিকেটিয়ার ফণী চক্রবর্তী থেকে আরম্ভ করে ফিয়ার্স লেনের ফাইন আর্টিস্ট ননী মজুমদার, ফড়িয়াপুকুরের নামজাদা ব্রীজ খেলোয়াড় লটু দত্ত, তালপুকুরের নামজাদা ভায়লনিস্ট হারান গাঙ্গুলী, সাহিত্যিক রমা বোস, গড়িয়ার ম্যাজিশিয়ান অতুল সরকার, শ্যামবাজারের বিখ্যাত ফুটবল প্লেয়ার শশী সামন্ত, কে না?

বস্তুত, ভাবতে অবাক লাগত, কি করে আমরা সব একত্র হয়েছিলাম, কে খবর দিলে বালীগঞ্জ প্লেসের বসন্ত-ভিলায় আমাদের গুণীদের সম্বর্ধনা করবার জন্যে ক্যাপ্টেন বি. কে. গুহ তাঁর সুন্দর বাগান, গাড়ি, বাড়ি, দামী সিগারেট, আর পেয়ালা পেয়ালা দার্জিলিং-এর টাটকা অরেঞ্জ পিকো নিয়ে অপেক্ষা করছেন। অবশ্য তিনি কোনো টি-গার্ডেনের অংশীদার ছিলেন বলে পেটি পেটি চা পেতেন আর তা-ই অকাতরে মুক্তহস্তে আমাদের পান করতে দিয়েছেন। বসন্ত-ভিলার কিচেনে একটা উনান সূর্যোদয় থেকে আরম্ভ করে রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত জ্বলত আর সেই উনানে চাপানো থাকতো প্রকাণ্ড গরমজলের হাঁড়ি। বগ্‌বগ্ করে জল ফুটত আর তাই থেকে কখনো অতুল, কখনো আমি কি শশী কি হারান নিজের হাতেই কাট্‌লিতে খানিকটা খপ্ করে ঢেলে নিয়ে তাতে মুঠ মুঠ পিকো ভিজিয়ে পানীয়টি তৈরী করেছি, তারপর তা

পৃষ্ঠা ছই

পেয়ালায় ঢেলে এবং তাতে চুমুক দিতে দিতে আবার ফিরে এসেছি বসন্তবাবুর ড্রয়িং-রুমে। হয়তো অতুলের তাসের ম্যাজিক চলছে, কি সাহিত্যিক বমার সন্তবচিত প্রেমের গল্পপাঠ কি হারানের কুশলী হাতের বেহালা বাজনা!

নিশ্চয়ই, বসন্তবাবু গুণীলোক ছিলেন, না হলে এতগুলো গুণী ছেলেকে তিনি কি করে ধরে রাখতেন তাঁর বাড়িতে চব্বিশঘণ্টা। এবং বসন্ত-পত্নী।

বিকেল পড়তে মিসেস গুহ আমাদের বাগানে টেনে নিয়ে গেছেন। সবুজ রং করা ডিম্বাকৃতি সারি সারি বেতের চেয়ারে বসে আমরা গল্প করেছি, গান গেয়েছি, আবৃত্তি করেছি। ক্রিকেটিয়ার ননী তার অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণের কাহিনী শোনাতো, দিগ্বিজয়ী খেলোয়াড়। যখন ওর গল্প চলতো ক্যাপ্টেন গিন্নী নিঃশব্দে ঘুরে ঘুরে দামী হাভানা চুরুটের বাক্সটি আমাদের নাকের সামনে বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমরাও কথাটি না কয়ে চুরুটটি তুলে নিয়ে ক্যাপ্টেনের সুরম্য লাইটার থেকে তাতে অগ্নি-সংযোগ করে পুনরায় মজুমদারের খেলার গল্পে মনঃসংযোগ করেছি। হ্যাঁ, এত আদর করতেন মিসেস গুহ। নিজের হাতে খোসা ছাড়িয়ে তিনি আমাদের আপেল কেটে খাওয়াতেন, আনারস, ফজলী আম, সিঙ্গাপুরী কলা, বাতাবী নেবু। বাগানের মধ্যে চলে আসতো সিঙ্গাড়া, সবশেষে ট্রে-ভর্তি ছাব্বিশটি সোনালী পেয়ালা। সোনার রঙ চা চলকে উঠতো কথা হাসির ধাক্কায়। আমরা চব্বিশজন আর কর্তা-গিন্নী।

আ, কি আড্ডা!

বাড়িটা জমিয়ে রাখতুম, বলা চলে জমে থাকতুম সব বসন্ত-ভিলায়।

দুপুরে চলতো ব্রীজ, পাশা, বাগাটেলী, পিংপং, ক্যারম। কি ক্যারিকেচারিস্ট কেদার নন্দীর কণ্ঠ ও বিচিত্র মুখভঙ্গী। বাদল চাকলাদারের ইণ্টারন্যাশনেল পলিটিক্স। বিখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত-গায়ক শ্রীপতি চ্যাটার্জির খালি গলার গান। প্রোগ্রাম ছিল না কিছু। প্ল্যান করে ফূর্তি করা নয়। এমনি। যখন যেটা ভালো লাগতো।

'রিটায়ার্ড লাইফ। এখন আর রুটিনের বালাই নেই।' ক্যাপ্টেন বলতো, 'রাশ ছেড়ে দিয়ে ফূর্তি করব বলেই তো তোমাদের ডেকেছি, ইয়াংমেন।' গুহ বাঘের চোখের মতন দুই বিশাল জলজলে চোখে, বলা চলে আসল প্রতিদ্বন্দ্বীর দৃষ্টিতে আমাদের চব্বিশটি চওড়া বুকের দিকে যখন তাকিয়ে থাকতেন, দেখে ভয় হতো। যেন আনন্দের আতিশয্যে আমাদের ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়বেন, নাকি ঈর্ষার উত্তেজনায়, ভাবতাম। এত বড় ছিল তার শরীর, অতিদীর্ঘ দেহ। হাতের কব্জিতে এখনো কত জোর তা দেখিয়ে দিয়েছেন একদিন ক্রিকেটিয়ারের সঙ্গে বক্সিং লড়ে।

এমনিও হাত পা সুস্থির থাকত না বুড়োর। এর কাঁধে কিল, ওর পিঠে ঘুসি, ওর পেটে গুঁতো, তার পিছনে ল্যাং-মারা চব্বিশ ঘণ্টা চলছিল। আর, নাক দিয়ে এক ধরনের হেসে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে আওয়াজ বার করা, আক্ষেপ? আস্ফালন? 'ইয়াংম্যান, ইয়াংম্যান।'

যেন যৌবনের গন্ধে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল, উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল পঁয়ষট্টি বছরের পুরোনো রক্ত। খেতে বসে সবচেয়ে বেশি খেতেন, সবচেয়ে বেশি আওয়াজ হত তাঁর দাঁতের। পাঁঠার হাড় কি রুইয়ের মুড়ো কুড়মুড় করে যখন ভাঙতো। আর ঠিক তখন, 'ফ্রেণ্ড, আর একটু খাও,

আর একটু দিই.' বলে গুরুগিন্নী রূপোর চামচ উপুড় করে মাংস, ঝোল, মাছের কালিয়া, মুড়িঘণ্ট আমাদের পাতে ঢেলে দিতেন, ঠেলে দিতেন চাপ চাপ পোলাও। 'এই বয়েস খাবার। কাঁচা রক্ত। লোহা খেয়ে হজম করবে, নইলে কিসের জোয়ান মরদ ছেলে।' কথা শেষ করে রূপোলী কণ্ঠে গৃহিণী ঘুরে ঘুরে হাসতেন।

সত্যি, ওই বয়সেও রূপোলী ছিল তাঁর গলা। ভেবে অবাক হতুম, শুধু গলা? তাঁর গাল ও গলার অপূর্ব মসৃণ ত্বক দেখে কতদিন আমরা চমকে চমকে উঠেছি এবং ভেবেছি এ কি করে সম্ভব। এও কি সম্ভব পঞ্চাশের প্রান্তবর্তিনী নারীদেহে এই রূপ। নিটোল সুন্দর বেণী কানের দুদিকে ঘিরে কাঁধ বেয়ে যখন আমাদের পেটের কাছাকাছি এসে ঠেকত, কেন জানি একটুও বেমানান ঠেকত না, বরং চকিত হৃদস্পন্দন নিয়ে ইয়ং ফ্রেণ্ডদের কেউ-না-কেউ প্রায় রোজই প্রতিজ্ঞা করতাম, 'আজ বাজারের সেরা অর্কিডটি কিনে এনে উপহার না দিলে গৃহিণীর অসম্মান করা হবে।' অর্থাৎ প্রীতিভাজনের বিনিময়ে প্রীতি উপহার দেওয়া।

বিকেলে সেই অর্কিড হাতে নিয়ে গুরু-গিন্নী আমাদের সঙ্গে যখন আড্ডায় বেড়ায় মেতে গেছেন তখন পিট্‌পিট্‌ চোখে বিরলকেশ স্থূলোদর গুরু আমাদের দিকে তাকিয়ে ভেবেছেন ইয়ং ফ্রেণ্ডদের নিয়ে আর কি আনন্দ করা যায়, অন্যরকম ফূর্তি।

পরদিনই ক্যাপ্টেন তিনটে ট্যাক্সী ভাড়া করেছেন। সঙ্গে আছে তাঁর গাড়ি। ছাব্বিশজন হৈ-হৈ করে গঙ্গার ধারে বেড়িয়েছি, বোটানিক্যাল গার্ডেনে গেছি।

ক্যাপ্টেন কোটপেণ্টুলন খুলে আমাদের সঙ্গে জলে নেমে সাঁতার কেটেছেন, খালি গায়ে মাঠে ছুটোছুটি করেছেন একাধিকবার।

অবশ্য ক্যাপ্টেন-গিন্নীও তখন থাকতেন সঙ্গে।

সাঁতারের শেষে খেলার শেষে আবার যখন আমরা হৈ-হৈ করে গাছের ছায়ায় এক জায়গায় জড়ো হয়েছি, ক্যাপ্টেন-গিন্নী বেণী দুলিয়ে দুলিয়ে তাঁর সঙ্গে-আনা হাঁড়ি থেকে অনেক সন্দেশ আর পেস্তার বরফি তুলে আমাদের হাতে গুঁজে দিয়েছেন আর মিটিমিটি হেসেছেন।

আর বুড়ো ক্যাপ্টেন হাঁ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে কি তখন ভেবেছেন যেন।

যাকগে, যতই আড়াআড়ি করুন তাঁরা ইয়ং ফ্রেণ্ডদের নিয়ে, তরুণ বন্ধুদের সান্নিধ্য-সুখ ভোগের লালসায়, আমরা কিন্তু দু'জনেরই মনোরঞ্জনের জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিলাম। গিন্নীকে যেমন কাঁড়ি কাঁড়ি ফুল এনে দিয়েছি কর্তাকেও উপহার দিয়েছি বাক্স বাক্স চুরুট। খুশী ছিলেন দু'জনই।

বসন্ত-ভিলা।

বসন্তের সেই অরণ্যে হাসি গান লম্ফ-ঝম্পের শেষ ছিল না। আমাদের লাভ ?

আগেই বলা হয়েছে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় পেয়ালা ভর্তি ধূমায়িত সোনালী চা, দামী চুরুট, ফি শনিবার মুর্গি পাঁঠা মেরে মজাদার ফিস্টি, এবং ফাঁক পেলেই ট্যাক্সী চেপে আনন্দ-অভিযান।

সেই সুখের আড্ডা ছেড়ে কে-ই বা আসে। আর, কেউ তো আমরা হাতি-ঘোড়া মারছিলাম না। আর্টিস্ট, খেলোয়াড, ম্যাজিশিয়ান, কেরিকেচা-

রিস্ট, কি কবি বলেই যে হুট্ হুট্ করে এক একজন চাকরি পেয়ে যাব আর দশটা-পাঁচটার নিয়মিত জীবন যাপন করব এমন সমাজব্যবস্থাই কি আমাদের আছে। সব বেকার। বাড়ির লোক 'দূর্-দূর্'—করছিল।

বাইরে ঘোরার সম্বল নেই।

তাই যৌবনের সাধ-আহ্লাদ বুকের ভিতর লুকিয়ে যেন অনেকটা নাচার হয়ে আমরা বুড়ো-বুড়ির প্রসারিত শাখায় মধুর চাক বেঁধেছিলাম। ভারি সুখে কাটছিল দিনগুলি!

কে জানতো সেই বসন্তের অরণ্যে আগুন লাগবে। আমাদের গুনগুনানি থামল, পাখা ঝিমিয়ে এল একদিন। সেদিন এ ওর মুখের দিকে অসহায় চোখে চাওয়া-চাওয়ি করলাম কতক্ষণ।

তারপর বসন্ত-ভিলা থেকে বেরিয়ে এসে সব রাস্তার একটা চায়ের দোকানে ঢুকে গোল হয়ে বসে সমালোচনা করলাম একনাগাড়ে আড়াই ঘণ্টা। একশ কুড়ি কাপ চা খেয়েছিলাম সেই দোকানে মনে আছে।

'বুড়োটা স্বার্থপর।' ম্যাজিশিয়ান বলল।

'বুড়িটা বিশ্বাসঘাতকিনী।' সাহিত্যিক মন্তব্য করল।

আশ্চর্য, বলাবলি করতে লাগলাম, কি করে ওরা না বলে পারল এতকাল। না কি আমরা ছোঁ মেরে নিয়ে যেতাম, কি খোঁজ পেলে চড়াও করতাম গিয়ে ওর বোর্ডিং।

বলব কি, গাড়ি থেকে নেমে একটা এটাচি হাতে ঝুলিয়ে সিঁড়ি বারান্দা পার হয়ে ও যখন আমাদের সামনে দিয়ে ওপরে উঠে গেল, মুহূর্তকালের জন্যে গৃহ-দম্পতি অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল।

অবশ্য স্বীকার করতে হল দু'জনকেই, তা ছাড়া উপায় ছিল না। অরণ্যে ফুল ছিল পাতা ছিল, হাসি গান মধু-মর্মর জাগানো হাওয়া কোনোটার অভাব ছিল না, এখন, হঠাৎ, সবুজ আর নীল পালকে মোড়া অপরূপ এই পাখি দেখে আমরা অস্থির উন্মনা হয়ে উঠব আর চব্বিশ জোড়া উৎসুক চোখ দিয়ে তখুনি মেয়ের চুল চোখ নাক ভুরু জরীপ করতে থাকব এ সহজ কথাটা কি বুড়ো-বুড়ি বুঝছিল না, বুঝতে পেরেই যেন দু'জনের চেহারা এমন ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল টের পেলাম. কিন্তু অপর-পক্ষ যখন দাঁড়াল না, আমাদের সঙ্গে দূরে থাক, বাপ-মা'র সঙ্গেও কথাটি না কয়ে সরাসরি ওপরে চলে গেল দেখে ক্যাপ্টেন ও ক্যাপ্টেন-গিন্নী নিশ্চিন্ত হলেন,—দু'জনের মুখের রং বেশ স্বাভাবিক হয়ে গেল। হেসে, অল্প-স্বল্প হেসে বললেন, 'সামনে ওর এগ্জামিন। আমাদের মাথা গরম। বোর্ডিং-এ থেকে তেমন পড়াশোনা হবে না, তাই লিখেছিলাম বাড়িতে চলে এসো, এখানে আমাদের চোখের সামনে কিছু না হোক অন্তত—কিছু-তো পড়াশোনা চলবে, কি বলো তোমরা? বেথুনে এবার আই-এ দিচ্ছে বোনা।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ', ভদ্রতার খাতিরে সমস্বরে যুবকদল মন্তব্য করলাম।

'বড্ড শাই। ভালো করে মেয়েটা আজো কারু সঙ্গে কথা বলতেই শিখলে না। অবশ্য একদিক থেকে ভালোই। মেয়েছেলে যখন।'

বুড়ি দাঁত বার করে হাসছিল, আমাদের পিত্তি জ্বলে যাচ্ছিল।

আর, এক থাবা মেরে, যেন মাছি তাড়ানোর মতন মেয়ের প্রসঙ্গটাই বুড়ো উড়িয়ে দিলে চালাকি করে। 'কাল ব্যারাকপুরে আমরা দল বেঁধে পিক্‌নিক্ করতে যাচ্ছি। আশা করি ইয়ং ফ্রেণ্ডরা সবাই উপস্থিত থাকবে।'

'তা থাকব।' একজন কি দু'জনের গলা মাত্র শোনা গেল, অন্যদিন এই প্রস্তাবে চব্বিশটা চড়া গলা একসঙ্গে হুররে করে উঠত।

'কিন্তু আজ সন্ধ্যায় সরকারের পায়রার ম্যাজিক, যেন মনে থাকে।' বিনুনী দুলিয়ে ওদিক থেকে ড্যাবড্যাবে চোখে গিন্নী অতুলের দিকে তাকাচ্ছিলেন। আকাশে পায়রা উড়িয়ে দিয়ে চিরকালের মতন তাকে অদৃশ্য করে দেওয়ার নতুন ম্যাজিক শিখেছে অতুল এবং সেটাই বিকেলে বসন্ত-ভিলার বাগানে দেখানোর কথা হচ্ছিল।

কিন্তু যে পায়রা আমাদের চোখের সামনে দিয়ে চকিতে দোতলার সিঁড়ির আড়ালে অদৃশ্য হল তার কথা ভেবেই তখন আমরা মুহুর্মুহু দীর্ঘশ্বাস ফেলছিলাম।

'লোটন।' সাহিত্যিক রমা মন্তব্য করল। 'ঝুটি।' বেহালাবাদক গাঙ্গুলী মাথা দুলিয়ে বলল, 'বাড়িতে এসে লোটন সেজেছে। খোঁপা খুলে বেণী করতে কতক্ষণই বা লাগে।'

'রাইট্যা।' শনী চিৎকার করে উঠল। 'শাই ফাই সব বাজে কথা। সেয়ানা মেয়ে। ওপরের সিঁড়ির মোড় ঘুরবার সময় সারসের মতন গলা বাড়িয়ে ও আমায় দেখছিল মাইরি। আমি সিঁড়ির ঠিক নিচে বসেছিলাম তোরা খেয়াল রাখিস?'

ফাইন আর্টিস্ট ননী মিটি মিটি হাসে।

'বাগান পার হয়ে যখন বারান্দায় ওঠে ঠিক তখনই তো আমার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। বাবা, নাবালক নাকি যে সেই চোখের ভাষা শর্মার অজানা থাকবে।'

'খুব ফরোয়ার্ড মেয়ে।' ক্রিকেটার চক্রবর্তী একটা গোল্ডফ্লেক ধরায়। 'বারান্দা ক্রশ্ করে যখন সিঁড়ির দিকে যায়, তোরা লক্ষ্য করিসনি, এটাচিটা ও ঠিক আমার রাইট এল্-বো ছুঁইয়ে নিলে।'

চুপ করে রইলাম সব কতক্ষণ। ভাবলাম আর রেস্টুরেণ্টের হাতলভাঙা পেয়ালায় করে আর এক প্রস্থ চা গিললাম। গুড মেশানো তেতো তামাটে স্বাদের চা। কিন্তু তা-ই 'অমৃত',—মনে মনে বললাম। বসন্ত-ভিলার অরেঞ্জ-পিকো দিয়ে বহুদিন জিহ্বা পুড়িয়েছি। আর কেন।

'তোরা সব বেকার বাউণ্ডুলে, বুঝলিনে?' চক্রবর্তী সবাইকে একটা করে সিগারেট প্রেজেন্ট করে। 'বুড়ো-বুড়ির সাধ আছে ব্যারিস্টার আই-সি-এস ছেলেকে জামাই করার। শুনলি না? আসতে-না-আসতে এগ্‌জামিনের লম্বা চওড়া বক্তৃতা।'

'মানে স্থরুতেই সোনার হরিণকে আলাদা করে রাখার ব্যবস্থা', শশী বলল, 'বেজায় হুঁশিয়ার ওদিক থেকে।'

'ব্যাচেলার সব তোরা। রক্ত গরম।' চক্রবর্তী কথা শেষ করে তেরছা ঠোঁটে হাসল আর ধোঁয়া ছাড়ল। আমরা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

কিন্তু এখন কি করা যায়, জল্পনাকল্পনা করলাম, একযোগে সবাই বসন্ত-ভিলা স্ট্রাইক্ করব? যদি আর না যাই কেউ? দেখি বুড়ির দিন কাটে কা'দের নিয়ে, কা'কে দেখায় পাকা বেণী আর জর্জেট-মোড়া মোটা কোমরের হেলানি-দুলানি? চুপচাপ একলা বাড়িতে বসে থেকে বুড়োটার হোক ডায়বেটিস। ইয়ং-ফ্রেণ্ডদের গলা জড়িয়ে বোতল বোতল বীয়ার টানা আর মুর্গির হাড় চিবানো শেষ করে দিই। কি বলিস?

'লাভ নেই।' সাহিত্যিক রমা মন্তব্য করল। 'শেষ পর্যন্ত কি হয় ছাখো না। পাখি যখন একবার দেখে ফেলেছি, পাতার আড়াল দিয়ে ঢেকে রাখবে ক'দিন? কতক্ষণ? বরং আড্ডা আরো গরম ক'রে তুলব ও-বাড়িতে আমরা। আঠালীর মতন লেগে থাকব।'

'পাখি তা'লে উঁচু ডাল থেকে নিচে নেমে আসবে? দোতলার পড়ার ঘর ছেড়ে বাগানের ঘাসে?' ফুটবলার সামন্ত প্রশ্ন করল, 'সবুরে মেওয়া ফলবে?'

'আলবৎ।' ক্রিকেটার বলল। 'ফলতে হবে।'

'আসতেই হবে।' তরুণ গোঁফের রেখায় আঙুলের মোচড় দিয়ে আর্টিস্ট মজুমদার বলল, 'ওর শরীরে যৌবনের কলরোল সুরু হয়েছে।'

'নেহাৎ যদি তালাচাবি দিয়ে ঘরে আটকে রাখে।' গলায় জোর দিলে ক্রিকেটার, 'চোখের কড়া পাহারা এই মেয়ে মানবে না। ওর জুতোর শব্দ আর ভুরুর ভাষা দেখেই আমি বুঝেছি সাবালিকা, সাঁতার কাটতে তৈরী।'

আমরা কতক্ষণ স্পন্দনহীন হয়ে যে যার আসনে বসে বসন্ত-ভিলার বেথুনে-পড়া কোমলাঙ্গী রাজহংসীর ছবিটি মানসপটে আঁকলাম।

'বন্দনার' অপভ্রংশ—'বোনা'। সুন্দর নাম। সেই নাম শুনে আমাদের বুকের মধ্যে দুন্দুভি বাজল।

'বন্দনা!' —আমাদের ডাকছিল তখন বুড়ো ক্যাপ্টেন। সময় অপরাহ্ণ। বাগানে অতুলের পায়রার ম্যাজিক আরম্ভ হয়েছে। ক্যাপ্টেন-

গিন্নীর জমকালো সাজ। গোলাপী সিল্ক। ময়ূরকণ্ঠী-রং ব্লাউজ। ঠোঁটে রং। চোখে কাজল। পায়ে শাদা উঁচু-হিলের জুতো। অবিকল একটি মেয়ের মতন। আর সবচেয়ে যা আকর্ষণীয়, কানের দুদিকে ঝুলিয়ে দেওয়া কিশোরীসুলভ লোটন বেণী। বেণী দুলিয়ে তিনি যখন আমাদের সামনে পাকা পেঁপে, ডালিম-দানা আর আঙুর ভরতি পাথরের বাটিগুলো সাজিয়ে দিতে ব্যস্ত, ও অতুলের চোখে চোখ রেখে মিটিমিটি হেসে 'ইয়ং ফ্রেণ্ড, তোমার পায়রা আজ আকাশের কোন্ কোণায় লুকোয় আমি ধরব, ধরে ফেলব সব জারিজুরি,—দৃষ্টির ধার তোমার চেয়ে আমার কম নেই' বলে ক্যাপ্টেনের দিকে ঘাড় ঘুরিয়েছেন, দেখা গেল ক্যাপ্টেন ভয়ানক গম্ভীর। তাঁর দৃষ্টি ঠিক আকাশের দিকে নয়, দোতলার কোন জানালার ওপর নিবদ্ধ। ইতিমধ্যে আমরাও সহস্রবার সেই জানালায় দৃষ্টি বুলিয়েছি এবং হতাশ হয়ে ফের অতুলের মুঠোর মধ্যে ধরা শাদায়-কালোয় চিত্রাল পায়রাটাকে দেখেছি।

পায়রা ভয়ানক ছটফট করছিল।

ক্রিকেটার বলছিল, 'ছেড়ে দে, বেচারাকে আর কতক্ষণ কষ্ট দিবি।'

সাহিত্যিক বলছিল, 'বিহঙ্গিনীকে বন্দী করে রাখা ঠিক নয়।'

'উঁহু, আমার চোখে ধুলো দিতে পারবে না বলেই তো ম্যাজিশিয়ান পাখি উড়োনোয় বিলম্ব করছে' বলে গিন্নী কাটা ডালিমের দানার মতন দাঁত বার করে যেই হেসে উঠছিলেন, কর্তা বাজখাঁই গলায় হুঙ্কার ছাড়লেন—'বোনা'। সেই ডাক শুনে আমাদের বুকের মধ্যে কেঁপে উঠল। বুঝি বা দোতলার জানালায় শান্তিপুরীর শুভ্র আঁচলের একটা ঝলকও দেখেছিলাম,

কিন্তু হাওয়ায় উড়িয়ে নেওয়া চৈত্রের মেঘের টুকরোর মতন তা আবার মিলিয়ে গেল।

'দেখলে কাণ্ড!' ইয়ং ফ্রেণ্ডদের সম্বোধন করে প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় ক্যাপ্টেন-গিন্নী বলেন, 'কাল বাদে পরশু মেয়ের এগ্‌জামিন, পড়ছে, আর শখ করে ডাকছে ও ওকে আড্ডায় ম্যাজিক দেখতে, তোমরা বলে ওকে বুঝিয়ে দাও, পড়া ছেড়ে বোনা এখন আসবে না।'

আমাদের বোঝাতে হল না।

গিন্নীর চেহারা দেখেই কর্তা চুপ।

যেন ড্যাব্‌ড্যাবে চোখে মিসেসের মুখের দিকে তাকিয়ে ক্যাপ্টেন মনে মনে বলছিলেন, শখটা যে তুমিই একলা পুরোপুরি লুটছ বন্ধুদের নিয়ে। পায়রার ঝটপটির চেয়ে তোমার ছটফটানি বেশি, তোমার বেণী কাঁপছে বেশি পাখির ঝুঁটির চেয়ে।

বোনা আর এলো না।

আর সমস্ত বিকেলটা, যতক্ষণ আমরা চুপচাপ বসে অতুলের পায়রা ওড়ানো দেখলাম, শুনলাম গাঙ্গুলীর বেহালা বাজনা, গুহগিন্নী বাগানে চরকিপাক খেয়ে আমাদের চব্বিশজনকে কখনো সিগারেট, কখনো চা, ফলমূল কি মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়িত করছেন, ম্যাজিকের শেষে অতুলের গলা জড়িয়ে ধরে সে কী উচ্ছ্বাস। 'ব্রাভো! এমনটি আর দেখিনি, কোথায় শিখলে এই খেলা আমায় শেখাও, আমায় শেখালে নিজের হাতে রোজ তোমায় পেস্তার বরফি করে খাওয়াব।' অতুল শব্দ করেনি।

বুড়ির কাণ্ড দেখে রমা দাঁত কিড়মিড় করছিল, ক্রিকেটার পায়ের

জুতো দিয়ে ঘাস ছিঁড়েছে, আর তিনি—স্বয়ং গৃহকর্তা অদূরে একটা পামের ছায়ায় দাঁড়িয়ে নিজের মনে চুরুট টেনেছেন।

অথচ অন্য দিন মিসেসের এই আদিখ্যেতা আমাদের কত ভালো লাগতো। উপভোগ করতাম, ইয়ং ফ্রেণ্ডদের নিয়ে গিন্নী প্রমত্ত থাকার দরুন ক্যাপ্টেনের দুর্জয় অভিমান এবং সঙ্গিনী-হারা মহিষের মত দূরে দাঁড়িয়ে আক্ষেপ-বিক্ষেপ ও নাকমুখ দিয়ে অবিশ্রাম বর্মা চুরুটের ধূম উদ্গীরণ।

কিন্তু গৃহিণীর এই নাচানাচি চুপ করে হজম করার পাত্র তিনি নন বলেছি আপনাদের। শনিবার পিক্‌নিক্ দেরী হয়ে যায়, দু'দিন অপেক্ষা করার সবুর নেই তাই সেটা তিনি পোঁৎ করে নিয়ে এলেন বিষ্যুৎবারে।

তিনটে ট্যাক্সি এবং তাঁর নিজের গাড়িতে চেপে সব রওনা হলাম। শেষ পযন্ত আশা—ছিল। কিন্তু—

সেখানে গিয়ে অবশ্য গিন্নী প্রচুর রাগ করলেন। কিন্তু শোনে কে।

বারুইপুরের তালপুকুরের ধারে চড়ুইভাতি খেতে আসার উদ্দেশ্যই হল দলবল নিয়ে দীঘির কালো জলে নেমে ছোক্‌রাদের সঙ্গে কোমর মিলিয়ে উদ্দাম সাঁতার কাটা। যেন ক্যাপ্টেন সেদিন গায়ে জোর পাচ্ছিলেন বেশি। আমাদের কারোর মাথায় গাঁট্টা মেরে কারোর চোখে মুখে পায়ের জল ছিটিয়ে ওঁর যেন আশ মিটছিল না, আর মাঝে মাঝে এর ওর গলা জড়িয়ে ধরে 'ইয়ং ফ্রেণ্ড, রাগ করলে কি, স্পোর্টসে নেমে রাগলে চলবে কেন, এসো, আর একবার দীঘিটা ক্রশ্ করি' বলে হুড়মুড় করে আমাদের হাত ধরে ফের জলে নেমেছেন। কিন্তু সেই সাঁতারে আনন্দ পেয়েছি কতটুকুন!

তীরে উঠে দেখি গিন্নী একলা চুপচাপ তালের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে মুখ কালো করে বসে।

'একলা এতগুলো মুর্গি আমি কি করে ছুলি। বোনা এলেও তো খানিকটা হেল্প করতে পারতো।'

'তুমি ক্ষেপেছো গিন্নী?' তোয়ালে দিয়ে গা মুছতে মুছতে কর্তা বলছিলেন, 'সামনে মেয়ের এগ্‌জামিন। আমাদের মাথা-ভাঙার দলে টেনে এনে ওর মাথাটি খাওয়া কেন, কি বলো বন্ধুরা?'

কেউ শব্দ করলাম না।

পুরো একটা ঘণ্টা জলে ডুবিয়ে এবং পর পর গোটা তিন চার বীয়ার শেষ করে বুড়োর চোখ দুটো পাটনাই পেঁয়াজের মত টকটকে লাল হয়ে গিয়েছিল।

অন্যদিন আমরা সেই চোখকে ঈর্ষা করেছি, পঁয়ষট্টিতে পা দিয়ে যৌবনের অমিত তেজ পোষণ করছিল বলে নীরব অভিনন্দন জানিয়েছি, কিন্তু সেদিন রাগ হল ঘৃণা হল। বরং সবাই তখন ভিজে কস্ট্যুম গায়ে রেখেই মিসেসের পাশে বসে পড়ে মুর্গি ছোলা ও ওঁর বাটনা বাটায় সাহায্য করতে লেগে গেলাম।

বাগানে অনেক পাখি ডাকল, ঘাসের উপর গোল হয়ে বসে আমরা প্রচুর মাংস পোলাও ভোজন করলাম, ঝিরঝিরে বাতাস দিলে, দীঘিতে ঢেউ জাগল। পাতার মুকুট মাথায় পরে ক্যাপ্টেন জংলী-রাজা সেজে নৃত্য করল, বনফুলের মালা গলায় ঝুলিয়ে ক্যাপ্টেন-গিন্নী জংলী-রাণী হয়ে গান করল, কিন্তু আমরা সব ঝিমিয়ে ছিলুম। আর আর দিনের মতন ইয়ং

ফ্রেণ্ডরা যে উত্তপ্ত হয়ে উঠছি না তা লক্ষ্য করারও সময় ছিল না দু'জনের। আনন্দে এত মগ্ন ছিল। মুর্গির হাড় চিবোনোর ছলে আমরা ঘাসের দিকে চোখ রেখে দাঁতে দাঁত ঘসলাম শুধু। আর কল্পনার চোখে 'বসন্ত-ভিলা'র দোতলার একটা জানালা দেখলাম। আমাদের মন পড়ে ছিল সেখানে।

পরদিন ফণী একটার বদলে এক ডজন ফুলের তোড়া নিয়ে গেল ক্যাপ্টেনের বাড়িতে। অর্থাৎ শেষ ছবি বিক্রী করে যে ক'টা টাকা বেচারা পেল, সব ফুলের তলে খরচ করল। শেষ চেষ্টা।

লাভ হল কিছু ?

একটি ফুলও যথাস্থানে পৌঁছয়নি।

চোখের ওপর দেখলাম এক একটা তোড়া থেকে বেছে বেছে ফুল নিয়ে বুড়ি বেণীতে গুঁজল ব্রোচে আটকাল। বুড়ো কিছু ফুল রাখল পকেটে কিছু গুঁজল বোতামের গর্তে। যেন ওদের জন্যেই ফুল নেয়া।

মুখ চুন করে মজুমদার সেই যে বসন্ত-ভিলা ছাড়ল আর গেল না।

ফুটবলার শশী কি করে ক'টা টাকা যোগাড় করে একদিন চার বাক্স চকোলেট কিনে নিয়ে যায়।

বুড়োবুড়ি ভাগাভাগি করে খেয়ে সব উজাড় করে দিলে। বেহালাবাদক তিন হাঁড়ি ভীমনাগের আম-সন্দেশ নিয়ে গিয়েও সুবিধা করতে পারেনি।

তালুকদার নিয়েছিল চুলের রীবন, স্নো, পাউডার, সাবান। যদি একটা যায়, একটাও দোতলার সিঁড়ি বেয়ে ওপরের কোন ঘরে গিয়ে ওঠে।

হেসে ক্যাপ্টেন-গিন্নী পুরানো রীবন ছেড়ে নতুন রীবন বাঁধলেন, বিকেলে তালুকদারের দেওয়া সাবান দিয়ে তিনবার মুখ ধুয়ে নতুন স্নো

মাখলেন। তালুকদার মুখ কালো করে বসে সেখানে ঘণ্টাখানেক কোনরকমে কাটিয়ে সেই যে চলে এলো, আর গেল না।

পরাজয়, প্রচণ্ড এক-একটা ধাক্কা খেয়ে খেয়ে সব খসে পড়তে লাগল।

কিন্তু বুড়োবুড়ি দমবে না।

'তাতে কি, এখনো তিনটে ইয়ং ফ্রেণ্ড আছে। ফূর্তি করতে এরাই যথেষ্ট।'

ক্যাপ্টেন আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে মোষের মতন মোটা ঘাড় নাড়েন। এসে যোগ দেয় গিন্নী।

'হ্যাঁ, আনন্দ করতে বেশি লোকজন নাই-বা থাকল। এবার আমাদের আড্ডাটি নিবিড় হয়ে জমবে, কি বলো চক্কোত্তি?'

ক্রিকেটার নীরব থেকে ঘাড় নাড়ল।

অর্থাৎ থেকে যাওয়ার মধ্যে আমি, ম্যাজিশিয়ান ও সাহিত্যিক রমা আছি শুধু বসন্ত-ভিলায়।

গিন্নীর কথা শুনে আমরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম, আর চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

তারপরও ক'দিন কাটল।

শরতের শিউলিরা মজে গেল। শীতের কনকনে বাতাস বইছিল। হঠাৎ শোনা গেল বোনার এগ্জামিন শুরু হয়েছে।

রাস্তার সেই চায়ের দোকানে ঢুকে তিনজন আবার জল্পনাকল্পনা আরম্ভ করলাম।

'যদি শীত এলো বসন্ত আর কতদূর'।

সাহিত্যিক রমা হাতলভাঙ্গা কাপ থেকে মুখ তুলে বলল, 'এতকাল সবুর করেছি, এবার মেওয়া ফলবে, আমি বলেছি তোদের আগে।'

'এগ্জামিন শেষ হতে ক'দিন লাগবে?' ম্যাজিশিয়ান আমার মুখের দিকে তাকায়।

'সাত দিন।' বললাম।

'সাত দিনের মধ্যে ভিলার সবগুলি গোলাপ কলি ফুটবে।' সাহিত্যিক রমা কাপটা টেবিলে নামিয়ে রাখে।

আমরা বসে বসে গোলাপের স্বপ্ন দেখলাম। রেস্টুরেন্টের ময়লা টেবিলে মাছি বিজবিজ করছিল।

হঠাৎ ম্যাজিশিয়ান নিজের মনে হেসে উঠল। কতক্ষণ পর সাহিত্যিকও হাসল।

দু'জনের নীরব হাসির কারণ বুঝলাম। সফল হবার স্বপ্ন দেখছিল তারা।

আপনারা শুনে হয়তো হাসবেন। আমিও হেসেছিলাম। আমিও স্বপ্ন দেখছিলাম বসন্তের রৌদ্র, প্রজাপতি ও অফুরন্ত গোলাপের হাটে বসে এগ্জামিনের শিকল থেকে সত্যমুক্তা, হৃষ্টমনা, স্বচ্ছন্দগামিনী অষ্টাদশীকে সামনে রেখে গল্প করছি, হাসছি, গান করছি, খেলছি। ক'দিন, কতকাল বাপ-মা ওকে ঠেকিয়ে রাখবে?

'ভালোয় ভালোয় পরীক্ষাটা ও দিয়ে সারুক।' দার্শনিকের মত দুই চোখের তারা তুলে ম্যাজিশিয়ান মন্তব্য করল।

আর এক প্রস্ত চায়ের ব্যবস্থা করে আমি বললাম, 'হ্যাঁ, ওদিক থেকে মেয়ে বাপ-মাকে সন্তুষ্ট করবে। চালাক, বোকা নয়।'

'এক দিক বজায় রাখুক, তবে তো আর একদিক পাবে। পরীক্ষায় ভালো করলে কর্তা-গিন্নী মেয়েকে আমাদের সঙ্গে মিশতে দেবে বেশি, বোনার এইটুকু বোঝা উচিত, এতটুকুন বোঝার বয়েস হয়েছে ওর।' রমা বোস আমাদের চোখে চোখ রাখল।

'কি বলছো তোমরা?'

'একশোবার, এক হাজারবার।' আমরা রাস্তার একটা ঘেয়ো কুকুরের দিকে তাকিয়ে গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ভগবানকে ডাকলাম।

'ওর পরীক্ষা ভালো করে দাও, ওকে ফার্স্ট করে দাও, বসন্ত-ভিলার মান বাড়ুক, তবে তো আমাদের আশা।'

জানি না, ভগবান এই প্রার্থনা শুনেছিলেন কি না। মাছি ও ধোঁয়া-ভর্তি রেস্টুরেণ্টে বসে তিনজন সেদিন মাথাপিছু আট কাপ চা খেয়েছিলাম। ভাগ্যিস্ রেস্টুরেণ্টওলার সঙ্গে ইতিমধ্যে আমাদের জানাশোনা হয়ে গিছল! ধারে খেয়েছিলাম সব।

হ্যাঁ, তার পরের ঘটনা।

শুনুন আমাদের এক-একজনের ভাগ্যবিপর্যয়ের কাহিনী। বোনা ও পরীক্ষায় এত ভালো করবে, তা ওঁরা আশা করেননি। ক্যাপ্টেন যে ক্যাপ্টেন-গিন্নী সরবে ঘোষণা করলেন এক বিকেলে।

শুনে আমরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

'অবশ্য ফল বেরোতে দেরি আছে।' বলছিলেন গিন্নী।

'কর্ম যখন ভালো হয়েছে, তার ফলও ভালো হবে।' সাহিত্যিক রমা দার্শনিক উক্তি ছাড়ল। 'সব কটা প্রশ্নের উত্তর ভালো হয়েছে, আর চাই কি।'

'হ্যাঁ', হুঁস্ করে ক্যাপ্টেন নাক দিয়ে চুরুটের ধোঁয়া ছাড়লেন। 'এবার নিশ্চিন্ত মনে আমরা আমোদফুর্তি করব। এসো, ম্যাজিশিয়ান, কাল সকালে নতুন খেলা দেখাও।'

'খুব ভালো একটা খেলা শিখেছি।' আনন্দে চোখ বড় করল ম্যাজিশিয়ান। আর চোখের দৃষ্টিকে বেচারা এক ফাঁকে দোতলার একটা জানালার ওপর বুলিয়ে নিলে, কর্তা গিন্নী লক্ষ্য করেননি, আমি ও রমা লক্ষ্য করেছিলাম।

বলা চলে বহুদিনের প্রত্যাশিত সেই সোনালী প্রত্যূষ। খুব সকালে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম সেদিন তিনজন বসন্ত-ভিলায়।

গিন্নী শুকনো বেণী দুলিয়ে সাদর সম্ভাষণ জানালেন। কর্তা পা ফাঁক করে বিলিতি কায়দায় ইয়ং ফ্রেণ্ডদের করমর্দন করলেন। একটা উৎসবের সুর ছিল গোড়াতে। বাগানে চেয়ার পড়ল। চায়ের ট্রে চলে এলো, এলো কেক্ বিস্কুট মাখন রুটি কলা ডিম আর তিন টিন সিগারেট।

চায়ের প্রথম পর্ব শেষ হতে গিন্নী প্রস্তাব করলেন, 'এবার তোমার খেলা আরম্ভ হোক্ সরকার।'

আমি অতুলের চোখের দিকে তাকালাম, অতুল তাকায় রমার দিকে।

না, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আশা ছিল আর একটা চেয়ার পড়বে, আর একজন উপস্থিত থাকবে ম্যাজিক দেখতে।

নতুন তাসের প্যাকেটটা দুবার হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করে অতুল পরে সেটা সামনের টিপয়ের ওপর নামিয়ে রাখল।

'কি ব্যাপার?' গিন্নী ভুরু কুঁচকোন।

'কোনো অসুবিধা হচ্ছে, ব্রাদার?' কর্তার মোটা ঘাড় সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

'না।' অতুল শুকনো হাসল। 'আমি এমন একজনের হাতে তাস রাখতে চাই যে তাস খেলা জানে না, এমন কি তাসের দাগও ভালো চেনে না, তবেই এ খেলার চার্ম থাকে।'

রমা ও আমি পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম এবং ঠোঁট টিপে হাসলাম।

ওদিকে কর্তা গিন্নীর দিকে তাকান, গিন্নী তাকান কর্তার দিকে। দু'জনেই তাসে বৃহস্পতি। হুট করে অতুল বলল, 'বন্দনাকে ডাকুন না, ওর তো পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। আর আমার বিশ্বাস তাসটাস ও তেমন ভালো চেনে না। রাতদিন পড়াশোনা নিয়েই তো আছে, ছিল।'

কর্তা আমতা আমতা করেন। 'হ্যাঁ, না, কথাটা মিথ্যে নয়, তাস-ফাশের স্কোপ বড় একটা পায় না ও, কিন্তু কিন্তু—'

গিন্নী কর্তার চেয়েও ধূর্ত। খল্ খল্ হেসে উঠে বললেন, 'চেনে না কি, বোর্ডিং-এ থাকে মেয়ে, পাঁচটি মেয়ের সঙ্গে মিশে কমবেশি এক আধটু নিশ্চয়ই শিখেছে।'

'তা হলেও ওকে আমি ডাকতে চাই না।' যেন ইতিমধ্যে মগজ পরিষ্কার হয়ে গেছে কর্তার। প্রস্তাবটি তিনি অন্যভাবে এড়ান। 'কাল সন্ধ্যার পর আই-স্পেশালিস্টের কাছে নিয়ে গেছলাম ওকে। পরীক্ষার ক'টা মাস চোখে তো আর চোট কম পড়েনি। বোধ হয় গ্লাস নিতে হবে। শুয়ে আছে।'

'ওকে ডাকা না ডাকা সমান। মেয়ে এখন একরকম অন্ধ বলা চলে।' গিন্নী এবার ফুরফুর করে হাসলেন। 'বেশ তো ওই বাচ্চাটাকে ডাকো না। ওর হাতে তাস রেখে তোমার ম্যাজিক সুরু কর।'

অদূরে বাগানের মালী কাজ করছিল। পাশে দাঁড়িয়েছিল মালীর সাত আট বছরের ছেলে।

'এই ঘেণ্টু ইদিকে আয়।' গিন্নী ডাকলেন।

ঘেণ্টু নোংরা দন্তরাজি বিকশিত করে অতুলের সামনে এসে দাঁড়ালো তাস ধরতে। বাগানে রৌদ্র গোলাপ প্রজাপতি ও ফুরফুরে হাওয়া থাকা সত্ত্বেও মনে হল যেন মরুভূমিতে বসেছিলাম আমরা।

কোনো রকমে তাসের খেলা শেষ করে অতুল চিরদিনের জন্যে বসন্ত-ভিলা ছাড়ল।

দুপুরে রেস্টুরেন্টের হাতল-ভাঙা পেয়ালা সামনে নিয়ে সাহিত্যিক ও আমি মাথা ঘামালাম।

'যেদিন ওর চোখ খুলবার পালা ঠিক সেদিনই ওকে অন্ধ করে রাখল।' যেন এতকাল পর হাল ছেড়ে দিলে রমা।

'স্বার্থপর বাপ মা।' দাঁত কিড়মিড় করে বললাম, 'তবু শেষ পযন্ত আমরা দেখব।'

'লাভ নেই।' রমা বোস বিড়ি ধরায়। 'খামোকা সেখানে গিয়ে আর অপমানিত হওয়া কেন।'

'উঁহু।' আমি পেয়ালার ধার থেকে ময়লা মাছি দু'টোকে হাত নেড়ে তাড়িয়ে দিয়ে বললাম, 'বরং না-যাওয়াতেই আমাদের অপমান বেশি

হবে। যৌবনকে এভাবে পরাজয় স্বীকার করতে দিতে আমি রাজী নই।'

ক্ষোভে উত্তেজনায় সাহিত্যিকের দুই চোখ জ্বলছিল, লক্ষ্য করলাম। রুক্ষ চুল। বেশভূষার পারিপাট্য ক'দিন ধরে চলে গেছে বেচারার।

কি করি, কি করব। ভাবতে ভাবতে, রমা তার বহুকালের হাতঘড়িটা চায়ের দোকানে বাঁধা দিয়ে ক'টা টাকা ধার নিলে।

অনেক দুঃখে হাসলাম।

'বোনাকে নিয়ে সিনেমায় যাবি ?'

পরম দুঃখে রমাও না হেসে পারলে না। তারপর গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমাদের কর্তব্য আমরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত করব। 'অসুস্থ ও, কিছু ফল কিনে নিয়ে যাই।'

রমার ফলের দশা কি হল জানেন ?

বড়বাজার থেকে বেচারা আপেল কিনেছিল, নিউ মার্কেট থেকে আঙুর, বৌবাজার থেকে কমলালেবু, কলেজ স্ট্রীট থেকে আখরোট আর হাতী-বাগানের তার পরিচিত কোনো দোকান থেকে আনার।

আশ্চর্য, কি করে কর্তা-গিন্নী দু'জনে ফলগুলোকে বারান্দায় বসে সাবাড় করলেন। খোসাগুলো চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে হাসলেন। বোনার দাঁত ফুলেছে আখরোট চিবোতে পারবে না, গা গরম টক্ আঙুর সুবিধা হবে না, কাল রাত্রে, পেটে একটু এসিড হয়েছিল কমলালেবু খেয়ে কাজ নেই ইত্যাদি।

ফলের ঝুড়ির গায়ে 'বোনা' নামাঙ্কিত লেবেল এঁটে দিয়েছিল

সাহিত্যিক। তাই। দুহিতাকে ফল না দেওয়ার কারণগুলো একটি একটি করে বলা শেষ করে ক্যাপ্টেন ও ক্যাপ্টেনগিন্নী রমাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন আর মধুর রসালো আঙুর আর কমলালেবুর কোয়া টপাটপ মুখে ফেলতে লাগলেন।

রমার মুখে শব্দ ছিল না।

মুমূর্ষুর মত চোখ করে পেটে একটা 'পেইন' হয়েছে বলে সেই যে বেচারা বসন্ত-ভিলা থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল আর গেল না।

বুড়ো-বুড়ি ভাঙল না।

যেন একলা আমাকে পেয়ে দু'জন আরও বেশি খুশী। 'দরকার কি ঝামেলায়। গণ্ডগোলে ফূর্তি গুলিয়ে যায়।' গলা জড়িয়ে ধরলেন তাঁরা।

একে একে সব ক'টি দেউটি নিভে গেছে। শিবরাত্রির সল্তের মত আমিই শুধু জ্বলছি। পাছে আমিও নিভে যাই সেই দুর্ভাবনাও ছিল দু'জনের।

তাই একদিন বুদ্ধি করে খানিকটা তেল ঢেলে দিলেন বাপ মা যৌবনের সল্তের গোড়ায়। অর্থাৎ বোনাকে আমার সামনে এনে দাঁড় করানো হল মিনিট দশেকের জন্যে। যেন দশ মিনিট এই মেয়েকে চোখের দেখা দেখলে আমি আরও দশ বছর কামড়ে পড়ে থাকব বসন্ত-ভিলার সিমেণ্ট।

আর ইয়ং-ফ্রেণ্ডকে নিয়ে সকালে বেরোবেন কর্তা। ইয়ং-ফ্রেণ্ডের হাত ধরে বিকেলে বেরোবেন গিন্নী।

তা দশ মিনিট খুব কম সময়ই বা কি। দশ বছর অপেক্ষা করা যায় এর জন্যে।

দশ সহস্র ঢেউ দিয়ে গেল ওই সময় আমার বুকের ভিতর।

কিন্তু বসে বসে সেই ঢেউ দেখতে কর্তা-গিন্নী মেয়েকে ডাকেননি আমার সামনে। ডেকেছিলেন মেয়ের চশমার বিল দেখতে। এইমাত্র ও ফিরেছে ডাক্তারের বাড়ি থেকে। বিল দেখা হয়ে যাবার পর মেয়েকে ওপরে চলে যেতে বলা হল।

এবং আমি যখন ওর চলে যাওয়া দেখতে দোতলার সিঁড়ির দিকে তাকিয়েছিলাম, তখন সেই ভয়ঙ্কর দামী নিষ্ঠুর মুহূর্তে দু'জনই আমার চোখে চোখ রেখে এমনভাবে দৃষ্টিকে চেপে ধরল যে শেষ পর্যন্ত সিঁড়ির দিকে আর তাকাতেই পারলাম না, পায়ের তলার সিমেণ্টের ওপর দৃষ্টি রেখে অত্যন্ত চুপিচুপি, প্রায় চুরি করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। শুনলাম জুতোর শব্দ ওপরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

'যাকগে।' যেন অদরকারী কথা বলছিলেন তাঁরা, বোনার চশমার বিষয়, ও চলে যেতে দু'জন ঝুপ্ করে দরকারী কথায় নেমে পড়লেন। 'তুমি আর আমি। আর কেউ থাকবে না। চলো একদিন। ফাইন এপ্রিল মর্ণিং।' এপ্রিলের আকাশের দিকে যত না তাকালেন, তার চেয়ে বেশি তাকালেন গিন্নী আমার মুখের দিকে। 'রাজী তো?'

শুনলে হাসবেন, আমি রাজী হয়ে গেলাম। আমি যে তখনও বোনার জুতোর শব্দ বুকের ভিতর শুনছিলাম। বুড়ি গৃধিনীর লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে ইয়ং-ফ্রেণ্ডকে দেখছিল।

বুড়ির কথায় রাজী হওয়াতে তৎক্ষণাৎ বুড়ো বায়না ধরল। 'চলো আমি তোমাকে নিয়ে বেরোবো—এক ইভিনিং-এ। এগ্রিড?'

আমি মাথা নাড়লাম।

দু'জনের মধ্যে ভাগ হয়ে গেলাম।

এখন একলা আমি তাই আব্দারটাও বেশি গাঢ় হল। সুযোগ বুঝে আমিও চট্ করে ছোট ছেলের মতন তৎক্ষণাৎ আব্দার করে বসলাম।

'বোনাও সঙ্গে যাবে।'

যেন নীল আকাশ থেকে বাজ পড়ল।

বেশ কিছুক্ষণ পর পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন কর্তা-গিন্নী, মুমূর্ষুর মতন হাসলেন।

তারপর নিমরাজী হওয়ার মতন দু'জনই মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললেন, 'ওর শরীরটা ভাল নেই। যাকগে, বোনা সঙ্গে থাকলে যদি তোমার ভাল লাগে, যাবে। একদিনের তো মামলা।'

আমি জয়ী। বাড়ি ফিরে মনে মনে বললাম আমাকে ধরে রাখতে হলে মেয়েকে সঙ্গে রাখতে হবে। আমি ছাড়া তোমাদের আর আছেই-বা কে।

যেন বুকের মধ্যে পূজোর ঘণ্টা বাজছিল। সেলুনে গিয়ে ভাল করে চুল ছাঁটলাম। ধার করে এক বড়লোক আত্মীয়ের দামী টাই স্যুট যোগাড় করলাম। একটি ঘণ্টা বুরুশ চালিয়ে পুরোনো জুতোটাকেই আয়নার মত চকচকে করে তুললাম। উত্তমের অন্ত ছিল না।

সাহিত্যিক বিক্রী করেছিল হাতঘড়ি। আমি বিক্রী করলাম ঘরের পুরোনো একটা চেয়ার, ছাতা, লণ্ঠন এবং প্রয়োজনীয় আরও দু'একটা তৈজস।

বোনার উপহার কেনার জন্যে টাকা চাই যে।

মনে মনে স্থির করলাম, আর আর বন্ধুরা যেমন ওর জন্যে স্নোবন ক্রীম পমেটম ফুল সন্দেশ ফল সাবানের বাক্স নিয়ে গিয়েছিল, আমি তা নেব না।

ক্যাপ্টেন কি ক্যাপ্টেন-গিন্নী আত্মসাৎ করতে না পারে এমন জিনিস দিতে হবে।

বোনার পায়ে লাগে এমন একজোড়া সুন্দর জুতো, আঙুলে পরতে পারে পাথর বসানো একটি আঙটি।

কিন্তু, কিন্তু এতটাকা যোগাড করা সম্ভব হয়নি। আর, ধারকর্জ্জ করে না হয় আরো কিছু টাকা যোগাড করলাম, কিন্তু মেয়ের আঙটি বা জুতোর মাপ পেতাম কোথায়। বুড়ো-বুড়ি দিত না।

বরং আঠারো বছরের মেয়ের গায়ে লাগতে পারে এমন আন্দাজ করে দর্জিকে দিয়ে কাশ্মীরী সিল্কের দুটো ব্লাউজ তৈরী করালাম। গলায় পরতে পারে মোটামুটি একটা মাপ ঠিক করে লাল কাচের একছড়া মালা কিনলাম। সস্তায় সুন্দর জিনিস।

বলা তো যায় না।

কচি খুকীর মতন সাধ করে বুড়ি ঐ মালাই গলায় পরতে পারে। গায়ে দিতে পারে মেয়ের ব্লাউজ। কিন্তু জানি কোনোটাই ওর শরীরে ধরবে না। মালা ছিঁড়ে যাবে, ব্লাউজ ফেটে যাবে। আর আর বন্ধুদের মতন আমার উপহারেরও দুর্দশা চিন্তা করে বুক দুরুদুরু করছিল।

উপহারের প্যাকেটটা প্রথমে পকেটে লুকিয়ে রাখলাম।

বলছি যেদিন সকালবেলা প্রস্তাবিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী ক্যাপ্টেন-গিন্নী আমাকে নিয়ে বেড়াতে বেরোলেন। ক্যাপ্টেন বোনাকে সঙ্গে গেঁথে দিলেন। উভয়েরই বোনাকে আমার সঙ্গে যেতে দেওয়ার গূঢ় কারণটা তখন বুঝলাম।

কিন্তু মেয়েকে বুড়ি কতক্ষণ বা মনে রাখল ?

আ, সেই ফুরফুরে একটি চৈত্র সকালের শোচনীয় মৃত্যু চিরকাল আমার বুকে লেগে থাকবে।

হাল্কা নীল চোখ, উঁচু নাক, ভরা লাল ঠোঁট বোনার। কোঁকড়ানো চুল, কোমল দেহবল্লরী।

কিন্তু কেমন করুণ ক্লান্ত মনে হল মেয়েকে।

প্রথম দিন বসন্ত-ভিলায় ওকে দেখার পর আমরা বন্ধুরা মিলে যে বর্ণনা করেছিলাম সেই বোনার সঙ্গে এই মেয়ের কত পার্থক্য, যখন খুব কাছে এসে দাঁড়ালো টের পেলাম।

আমার দিকে চোখ তুলে ও তাকাতেই পারল না। চোখ তুলেছে কি ক্যাপ্টেন-গিন্নীর খরদৃষ্টি তীরের মত ছুটে গিয়ে তাকে খণ্ডবিখণ্ড করেছে।

রক্তরাঙা পলাশ গাছের নীচে ঘাসরং সুজনী বিছিয়ে গিন্নী আমার সঙ্গে লুডো খেলতে বসলেন। ছবিটা একবার কল্পনা করুন।

বোনাকে অদূরে একটা উইটিবির পাশে মুর্গি ছুলতে বসিয়ে দেওয়া হল। বাটনা বাটতে হবে ওকে, রাঁধতে হবে।

'কেবল কলেজের পরীক্ষা পাশ করলে হয় না। এ সব কাজও শিখতে হয়। মেয়ে সন্তান।'

খেলার ফাঁকে ফাঁকে বুড়ি মেয়েকে এক একবার আড় নয়নে দেখে আমার দিকে চোখ তুলে হি হি করে হাসছিল। যেন হাসি নয়, শুকনো পাতা ঝরানো দমকা হাওয়া। আমার বুক ভেঙ্গে যাচ্ছিল।

পাতার আড়ালের গোলাপ কুঁড়ির মতন ঢিবির ওপাশ থেকে চোরা চোখ তুলে বোনা আমাকে দু' একবার দেখেছে, কিন্তু তা কত ক্ষণস্থায়ী কত ক্ষীণ। সঙ্গে ক্যাপ্টেন নেই, তার ওপর আমি একলা। বুড়ির আনন্দ যেন উত্তাল ঢেউ হয়ে হয়ে আমার ওপর আছড়ে পড়ছিল।

যে ভয় করছিলাম।

পকেটে হাত ঢুকিয়ে প্যাকেটটি এক সময় ঠিক বার করে নিলে। আমি বলতেই পারলাম না এগুলো বোনার। অত মোটা শরীরে ব্লাউজ পরতে গিয়ে তা ছিঁড়ে ফেলল, মালার যা দশা হল তা অবর্ণনীয়। ঘাসের ওপর ছিটকে পড়া লাল পাথরগুলোর দিকে তাকিয়ে কৃত্রিম অভিমানের সুরে বুড়ি কঁকিয়ে উঠিল। 'ছি ছি, এতকাল এক সঙ্গে থেকে এতদিন দেখেও কি তুমি আমার বডির প্রমাণ সাইজ না হোক মোটামুটি একটা মাপ ঠিক করতে পারলে না।' বলে বুড়ি খিল খিল হেসে উঠল, লক্ষ্য করলাম ঢিবির ওধার থেকে বোনা ঘাড় তুলে একবার এদিকে তাকিয়ে পরমুহূর্তে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আকাশের দিকে মুখ করে আমি প্রতপ্ত নিঃশ্বাস ফেললাম। একটা নিঃসঙ্গ প্রজাপতি মাথার ওপর ঘুরপাক খাচ্ছিল।

'ওকি, ফ্রেণ্ড, কথা বলছ না কেন, রাগ করলে?' ভাবছিলাম কতক্ষণে সময়টা কাটবে।

আমি কান পেতে ছিলাম ঢিবির ওপাশ থেকে কোনো শব্দ ভেসে আসে কি না শিল-নোড়ার কি এলুমিনিয়মের ডেকচিতে হাতা খুন্তি নাড়ার।

কিন্তু কোনো শব্দ তৈরী করার মৌলিকত্ব মা ওই মেয়ের মধ্যে সৃষ্টি হতে দেয়নি এই অনুমান করে ঘাসের ওপর শূন্য দৃষ্টি মেলে বুড়ির কাকলী শুনতে লাগলাম। এ ছাড়া আর উপায় ছিল কি।

পরদিন বিকেলে ছিল ক্যাপ্টেনের প্রোগ্রাম।

বুড়ি আমাদের সঙ্গে বোনাকে গেঁথে দিলে। আগের দিন সারা সকাল দুপুর আমায় নিয়ে বনভোজন করেও বুড়ির আশ মেটেনি, চেহারা দেখে তাই মনে হচ্ছিল।

ক্যাপ্টেন যখন আমার হাত ধরে গাড়িতে ওঠেন দরজায় দাঁড়িয়ে গিন্নী হাঁসফাঁস করছিলেন।

'যেখানে যাও, বোনাকে সঙ্গে সঙ্গে রাখবে।'

'রাখব।' গাড়ির দরজার বাইরে মুখ বাড়িয়ে কর্তা গিন্নীকে আশ্বাস দিলেন। 'নইলে আর তিনজন একসঙ্গে বেরুচ্ছি কেন। হা—হা।'

লক্ষ্য করলাম পিছনের সীটে পুতুলের মতন চুপ চাপ বসে বোনা আঙুলের নোখ খুঁটছে। আমার দিকে ও তাকাতে পারছিল না কেননা ক্যাপ্টেন মুহুর্মুহু ঘাড় ফিরিয়ে দুহিতাকে দেখছিলেন।

গিন্নী চোখের আড়াল হলে কর্তাও মেয়েকে বেশিক্ষণ মনে রাখবেন না আগেই অনুমান করেছিলাম।

বনভোজনের সময় বোনা তবু ধারে কাছে ছিল।

কিন্তু বনে গিয়ে ভোজন করার মেজাজ ক্যাপ্টেনের ছিল না তখন।

নির্জন নদীতীরে কি নিরালা পার্কেও গেলেন না তিনি। বীয়ারের নেশায় বড় বেশি নাগরিক হয়ে উঠেছিলেন। এপ্রিলের সুন্দর সন্ধ্যা। চৌরঙ্গি লক্ষ্য করে ক্যাপ্টেন গাড়ি ছোটালেন।

ফূর্তিটা ঠিক কি ধরনের হবে ভাবছিলাম, কি ভাবতে যাব, এমন সময় হঠাৎ তিনি আমার কানের কাছে মুখ সরিয়ে নিয়ে ফিসফিসিয়ে উঠলেন।

চমকে তাঁর চোখের দিকে চোখ রাখলাম। পঁয়ষট্টি বছরের ধূসর চোখ ক্ষুধিত বাঘের চোখের মতন জ্বলছিল।

আমি চুপ করে ছিলাম।

'কি, কথা বলছ না কেন, ফ্রেণ্ড?' যেন দমকা হাসির হাওয়ায় আমায় নাড়া দিয়ে তিনি সতেজ করে তুলতে চাইলেন। তাঁর হাসির ধমকে গাড়ির হুড কাঁপছিল।

তথাপি আমি চুপ।

যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে গলাটা হঠাৎ নিচু করলেন বসন্তবাবু।

'আজ গিন্নী সঙ্গে নেই। আজ তৃতীয় কোন বন্ধু পর্যন্ত নেই। কাজেই এসো—'

আমি তাঁর আবেশাতুর লোভী চোখে চোখ রাখলাম। পুরোনো চোখের শিরায় এত প্রচুর নতুন লাল রক্ত মুহুর্মুহু কি করে এসে জমে ভাবছিলাম।

অল্প অল্প হেসে তখনো তিনি আমায় উত্তপ্ত করে তোলার চেষ্টায় ছিলেন।

'বহুদিনের ইচ্ছা আমার, অনেকদিন ভেবেছি—' বলে ক্যাপ্টেন থামলেন।

কেননা আমি ঘাড় ফিরিয়ে পিছনের সীটে উপবিষ্টা তাঁর অষ্টাদশী কুমারী মেয়েকে দেখছিলাম।

'অ, আপত্তি তোমার ওখানে, ওর জন্যে ভাবনা কি।' যেন আমার নিরুত্তর তেজহীন হয়ে থাকার কারণ অনুধাবন করে ক্যাপ্টেন আগের চেয়ে চতুর্গুণ জোরে হেসে উঠলেন। 'এই তো লাইট-হাউস এসে গেল। ওয়ান্ট ডিজনে হচ্ছে। নির্দোষ বই। বোনা ততক্ষণ বসে দেখুক, কেমন? তুমি ততক্ষণ বসে সিনেমা দেখ, মা। আমরা দুই বন্ধু একটু বেড়িয়ে টেড়িয়ে আসি?' বলে তিনি মেয়ের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন।

কলের পুতুলের মতন ঘাড় কাত করল মেয়ে। এবং চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে গাড়ি লাইট-হাউসের দরজায় গিয়ে দাঁড়ায়। ক্যাপ্টেন চোখের ইঙ্গিতে বোনাকে নেমে যেতে আদেশ করলেন। নেমে গেল ও।

শেষ বারের মতন আমাদের মধ্যে গোপন দৃষ্টি বিনিময় হয়েছিল। বাসনার একটি শ্বেতকুঁড়ি মাথা জাগাতে না জাগাতে কাঁটার অরণ্যে হারিয়ে গেল। আমার পিঠে এবার জোরে নাড়া দিয়ে ক্যাপ্টেন সাড়া তুলতে চেষ্টা করলেন। 'আশ্চর্য একেবারে মিইয়ে গেলে দেখছি, বড্ড নার্ভাস তুমি।'

আমার মাথা ঝিমঝিম করছিল। ঘামছিলাম। সত্যি কেমন নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম। এ রকম একটা প্রস্তাব তিনি তুলবেন ভাবিওনি।

মেয়ে চলে যাওয়ার পর গাড়ির ভিতরটা আরো বেশি নির্জন মনে হয়। আহ্লাদে বিড়ালের মতন বসন্তবাবুর গলায় গরর্ শব্দ হচ্ছিল। যেন ঝোলা গুড়ের মতন লালা ঝরে পড়ছিল তাঁর জিভ থেকে কথা বলার সময়।

'কি, তবে কি বলছ একটিও নেই, একজন গার্ল ফ্রেণ্ডও তোমার নেই যে দু'জন গিয়ে একটা সন্ধ্যা একটু ফ‍ুর্তি করব। আমার অনেক দিনের শখ।'

কুণ্ঠিতভাবে মাথা নেড়ে বললাম, 'নেই।'

এবার শূয়ারের মতন 'ঘোঁৎ' শব্দ করে তিনি নাকে হাসলেন। 'একেবারে জলো, পানসা তুমি, ফ্রেণ্ড।' কি একটু ভেবে স্টীয়ারিং-এ হাত রেখে পরে বললেন, 'যাকগে, শহরে তো গার্লের অভাব নেই, আমি নিয়ে যাব তোমায়, আমার সঙ্গে চল।' সুরেন ব্যানার্জি রোড ক্রশ করে গাড়ি অপেক্ষাকৃত একটা নির্জন গলিতে ঢুকল। আস্তে আস্তে, চুরুটের হাল্কা ধোঁয়া ছাড়ার মতন তিনি কথাগুলো আমার সামনে ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন। 'যা-ই তোমরা বল, যতই বল, ভেতরটা আমার গ্রীণ আছে নিজেও ফিল্ করি, কিন্তু বাইরেটা তো পাকতে সুরু করেছে। বুঝলে, একটি ইয়ং ফ্রেণ্ড সঙ্গে না নিয়ে গেলে একটি মেয়ে তেমন জ্বলবে কেন, ষোল আনা ওর তাপ পাব কি করে—হা—হা, সত্যি কিনা ব্রাদার?'

অধোমুখ হয়ে নোখ দিয়ে গদির চামড়া খুঁটছিলাম।

সেদিন আর একবার বোনাকে দেখেছিলাম। সান্ধ্য বিহার শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে সিনেমা হাউস থেকে যখন ওকে আমরা গাড়িতে তুলে নিই।

আর দেখিনি। আর আমি যাইওনি বসন্ত-ভিলায়। তেইশজন খসল আমিও চিরকালের মত খসলাম।

তবু অনেকদিন লোভ হয়েছে, বসন্ত-ভিলার সামনের রাস্তা দিয়ে হেঁটেছি আর দোতলার জানালাটার দিকে তাকিয়েছি। কিন্তু সেই জানালা একদিনও খোলা দেখিনি। দেখতাম শুধু বুড়ো বুড়ি একলা চুপচাপ বাগানে বসে আছে কি বারান্দায় বসে আপেল চিবোচ্ছে লজেনস চুষছে আর থেকে থেকে তৃষিত চাতকের মতন পথের দিকে চেয়ে আছে।—

ওরা কার অপেক্ষায় প্রহর গুণত নিশ্চয়ই আপনারা অনুমান করতে পারছেন।